GBN S2 01

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

বাংলা (আধুনিক ভারতীয় ভাষা)

খণ্ড - ২

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়-বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, প্রধান, বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

সমন্বয় রক্ষক ঃ ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক মণ্ডলী

অধ্যায়	
৯, ১০	রত্নদীপ পুরকায়স্থ গুৱাহাটী
১১, ১২	দীপ্তি সাহা প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
১৩	ড° প্রসূন বর্মন কটন মহাবিদ্যালয়
১৪, ১৫	ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

সম্পাদনা ঃ

বিষয়বস্তু ও ভাষা-সম্পাদনা ঃ ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

গ্রন্থনবিষয়ে সম্পাদনা ঃ ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুৱারী, ২০১৮

This Self Learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handiqui State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 License (international): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পঞ্জীয়কের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুখ্য কার্যালয় ঃ পাটগাঁও, রানী গেট, গুয়াহাটি - ৭৮১ ০১৭; Web : www.kkhsou.in
মহানগর-দপ্তর ঃ হাউসফেড কমপ্লেক্স, দিশপুর, গুয়াহাটি - ৭৮১ ০০৬

এই শিক্ষণসামগ্রী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য নতুন দিল্লির 'দূর-শিক্ষা-পরিষদ'-এর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞ।

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠা নং

অধ্যায় ৯ ঃ **সাজাহান — ১** ১২১-১৩২

নাট্যকারের পরিচিতি ও ইতিহাসের কাহিনি; ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'; 'সাজাহান' নাটকের নায়ক বিচার ও নামকরণ; 'সাজাহান'নাটকের সংগীত ও সংলাপ

অধ্যায় ১০ ঃ **সাজাহান — ২** ১৩৩-১৪৭

সাজাহান নাটকের চরিত্র-বিচার ঃ মুখ্য চরিত্র, গৌণ চরিত্র

অধ্যায় ১১ ঃ ***জীবনস্মৃতি*— ১** ১৪৮-১৭০

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচয়; *জীবনস্মৃতি* ঃ সাধারণ আলোচনা; ঘর ও বাহির — মূল পাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ; ভৃত্যরাজক তন্ত্র —মূলপাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ; নানা বিদ্যার আয়োজন— মূলপাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ১২ ঃ ***জীবনস্মৃতি*— ২** ১৭১-১৮৭

ভানুসিংহের কবিতা — মুলপাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ; স্বাদেশিকতা — মূল পাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ; মৃত্যুশোক — মূল পাঠ ঃ পাঠ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ১৩ ঃ ***বিচিত্র প্রবন্ধ*— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ১৯০-২০৬

গ্রন্থকার পরিচিতিঃ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ; মূল প্রবন্ধ ঃ ছোটোনাগপুর ঃ ছোটোনাগপুর ঃ সামগ্রিক আলোচনা; মূল প্রবন্ধ — মা ভৈঃ, মা ভৈঃ — সামগ্রিক আলোচনা

অধ্যায় ১৪ ঃ **বাংলা ব্যাকরণ** ২০৭-২২৭

শব্দ, পদ, বাক্য ঃ পদ পরিবর্তন; বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ; বাংলা বানান ঃ বানান রীতি, অশুদ্ধ বানান ও তার সংশোধিত রূপ; শব্দভাণ্ডার ঃ শ্রেণিবিভাগ, মৌলিক শব্দ, আগন্তুক শব্দ; সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ ঃ সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ

অধ্যায় ১৫ ঃ **সংবাদ, অনুচ্ছেদ ও সারাংশ রচনা** ২২৮-২৩৯

রচনার নানা প্রকারভেদ; সংবাদ রচনা; অনুচ্ছেদ রচনা

প্রসঙ্গ পুস্তক ২৪০

খণ্ড-পরিচিতি ঃ খণ্ড — ২

আধুনিক ভারতীয় (MIL) ভাষার অন্তর্গত 'নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য এবং ব্যাকরণ ও রচনা' পাঠ্যবিষয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে একটি নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি গ্রন্থের অংশবিশেষ এবং ব্যাকরণ ও রচনা।

'নাটক' অংশে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *সাজাহান* নাটকটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকটি বাংলা ঐতিহাসিক নাটকেয় ধারার এক উজ্জ্বল সম্পদ। ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগী পরিবেশ-সৃজন, প্রাণবান সংলাপের প্রয়োগ ইত্যাদি সবই *সাজাহান* নাটকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাগত।

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* থেকে কয়েকটি অংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'স্মৃতিকথা' সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা। রবীন্দ্রনাথেয় *জীবনস্মৃতি* এই ধারার অভিনব সংযোজন। রবীন্দ্র-জীবনের একটি বিশেষ পার্বের ছবি এখানে ধরা পড়েছে। স্মিত হাস্যে নিরাসক্তভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবন কথাকে এখানে তুলে ধারছেন। দেশকাল তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রেক্ষাপট জানতে এই স্মৃতিকথার অংশটি সহায়ক হবে।

বিচিত্র প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ভাবনার ফসল। প্রবন্ধ সাহিত্য ও যে কত সরস এবং একইসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, নির্বাচিত প্রবন্ধগুলো তার প্রমাণ। যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিভাবনার অসাধারণ সম্মেলনে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ যে একটি আদর্শ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং তাকে শিল্পসার্থক করে তুলেহেন- নির্বাচিত প্রবন্ধগুলো পড়ে তা সহজেই বোজা যাবে।

সাহিত্যচর্চায় পাশাপাশি ব্যাকরণচর্চাও জরুরি। ব্যাকরণ আমাদের ভাষায় সংগঠনকে বুঝতে সাহায্য করে। বাংলা ব্যাকরণ থেকে কয়েকটি বিষয় বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ভাষাচর্চায় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

নিজের ভাবনাগুলোকে যথাযথাভাবে প্রকাশ করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে তাই নিজেকে প্রকাশের উপায় হিসেবে কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সে জন্য বর্তমান সংকলনে অনুচ্ছেদ ও সংবাদ রচনাকে পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে রচনায় পদ্ধতিগত দিকটায় জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলোয় গঠন সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা আমাদের সচেতন করতে।

খণ্ডটির আলোচনা পাঠের সময় ডানদিকে বা বাঁ-দিকে কয়েকটি চতুষ্কোণক্ষেত্র চোখে পড়বে। এসবের মধ্যে মূল পাঠের অন্তর্গত অল্পপরিচিত শব্দ ও পরিভাষাসমূহের অর্থ, টীকা ইত্যাদি দেখতে পাবেন। 'আসুন, জেনে নিই' শীর্ষক ক্ষেত্রগুলিতে মূল পাঠের সঙ্গে জড়িত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত 'আপনাদের করণীয়' অংশ নিজেদের অধ্যয়নে আরও সক্রিয় করে তুলবে এবং এর থেকে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে। তদুপরি, 'অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন'-এর অনুশীলনের মাধ্যমে আপনারা নিজেই নিজের জ্ঞানের বিচার করতে পারবেন। অধ্যায়গুলির আলোচনা পাঠের সময় প্রশ্নসমূহের উত্তর আলাদাভাবে লিখে নিয়ে খণ্ডের শেষে সন্নিবিষ্ট 'অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর'এর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে ভালো হয়। অধ্যায়টিতে আলোচিত বিভিন্ন ধারণাগুলির বিষয়ে অধিক জ্ঞানের জন্য 'অতিরিক্ত পঠন' শীর্ষক উল্লেখিত বইগুলি পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির কিছু নমুনা সংযুক্ত হয়েছে।

অধ্যায় ৯ ঃ সাজাহান — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ নাট্যকারের পরিচিতি ও ইতিহাসের কাহিনি

৯.৪ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'

৯.৫ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক বিচার ও নামকরণ

৯.৬ 'সাজাহান'নাটকের সংগীত ও সংলাপ

৯.৭ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৯.৮ অতিরিক্ত পঠন

৯.৯ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

৯.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা পাওয়া যায় এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের প্রকৃত নায়ক কে, এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সংগীত বিষয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৯.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়টি প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান' এর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়েছে কি না, নাটকের নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না, এই সঙ্গে নাটকের সংগীতর বিষয়ে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯.৩ নাট্যকারের পরিচিতি ও ইতি হাসের কাহিনি

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (বাংলা ১২৭০, ৪ শ্রাবণ) সেকালের বাংলা— সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী

ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনেই নয়, তাঁর সাহিত্যিক ও শিল্পী জীবনেও মাতা পিতার নিগূঢ় প্রভাব বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বপুরুষদের অনেকে কৃষ্ণনগর রাজাদের দেওয়ানী কর্ম করার জন্য তাঁদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ নামে খ্যাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কৃষ্ণনগরবাসীর কাছে অতিশয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, সুকণ্ঠী, সংগীতজ্ঞ, সদালাপী, তেজস্বী এবং সাহিত্যরসিক। ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' নামে কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' ও 'গীতমঞ্জরী' গ্রন্থ দুটিও বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

পিতা কার্তিকেয়চন্দ্রের প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই কাব্যরচনা শুরু করেন। স্বরচিত গানে সুর-সংযোগও করতে শুরু করেন বাল্যকালেই। দ্বিজেন্দ্রলালের উপর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এবং হরেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবও অবশ্য কার্যকরী হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন শুরু হয় কৃষ্ণনগরের 'অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলে'। এরপর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য আশানুরূপ পড়াশোনা করতে পারেননি। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ-এ এবং হুগলি কলেজ থেকে বি এ দুই পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৫৫৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যান। সেখানকার 'সিসেটার' কলেজে পড়াশোনা করে তিনি ১৫৫৬ সালে F.R.A.S উপাধি পান। বিলাতে থাকাকালীন তিনি 'Lyrics of Ind' নামে একটি ইংরেজি কবিতার বই প্রকাশ করেন । বিলাত থেকে ফিরে তাঁর মতো কৃতী ছাত্রকেও ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্মে নিযুক্ত থেকে ডেপুটির চাকরি নিতে হল। চাকরি জীবনে তিনি কোনোদিনই তৃপ্তি পাননি। কর্মসূত্রে তাঁকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে থাকতে হয়েছিল। ১৫৫৭ সালে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এম-এ পরীক্ষা দেবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয়। এর দশ বছর পর 'আর্য্যগাথা' (২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়। 'মন্দ্র' (১৯০২) কাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন। নিজের হাসির গানগুলিকে ভিত্তি করে তিনি 'কল্কি অবতার ' বা 'সমাজবিভ্রাট ' (১৫৯৫), 'বিরহ' (১৫৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক নাট্যকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পাষাণী'(১৯০০), 'সীতা' (১৯০২), এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪)। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সংখ্যাও নেহাত কম নয় । একসময় তাঁর গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য। তাঁর রচনা 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৫), 'মেবার পতন' (১৯০৫), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল-বিজয়' (১৯১৫), প্রভৃতি নাটক আজও সমান জনপ্রিয়। সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত্যুবরণ করেন।

৯.৪ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'

'সাজাহান' ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কতখানি সফল-- সে কথা বুঝতে হলে প্রথমেই আপনাদের জানতে হবে ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে। সাধারণ ভাবে এবং সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যে নাটকের মূল কাহিনি বা প্লট এবং প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে নির্বাচিত এবং নাট্যকারের রচনাশক্তির সহায়তায় যে নাটকের কাহিনি বা চরিত্রগুলি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠে তাই ঐতিহাসিক নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক— নামেই বোঝা যায়, একদিকে তা ইতিহাস এবং অন্যদিকে তা নাটক। ইতিহাসের তথ্য ঘটনা বা চরিত্রকে নাট্যকারকে গ্রহণ করতেই হবে এবং তার অতিরিক্ত জীবনের রসরূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে কবি-কল্পনার সাহায্যে। কিন্তু একাজ খুব সহজ নয়। তাই ঐতিহাসিক নাটক লেখাও কঠিন। অতীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া--কোনো বিশেষ রাজা বা সম্রাটের আমলের রীতি-নীতি, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সে সবের মধ্য দিয়ে ওই সকল ব্যক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় সত্যতার সঙ্গে চিত্রণই ঐতিহাসিকের কাজ। তথ্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু বলার স্বাধীনতা ঐতিহাসিকের নেই। কিন্তু নাট্যকারের কাজ তো মানুষের জীবন নিয়ে। ইতিহাসের নীরস তথ্যকে তুলে ধরা নাট্যকারের একমাত্র কাজ হতে পারে না। বরং ঐতিহাসিক তথ্যের কাঠামোর ওপর কল্পনার রশ্মিপাত ঘটিয়ে তাকে জীবন্ত করে তোলা নাট্যকারের লক্ষ্য। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা আপনাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক নাটক নাটকই, ইতিহাস নয়। তাই ঐতিহাসিক যথার্যতা যাই থাকুক না কেন, তাকে নাটক হয়ে উঠতে হবে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা-বাদশার কাহিনিই কি সেদিনের মানবজীবনের সমস্ত পরিচয়টুকু তুলে ধরে? ইতিহাস সাধারণত জীবনের বাইরের ঘটনাগুলির কথাই বলে, সেই ঘটনাগুলির মধ্যদিয়ে মানুষের অন্তরের পরিচয় দেয় না। সে পরিচয় দিতে পারেন নাট্যকার। ঐতিহাসিক নাটকের লেখক ইতিহাসের স্বরূপ প্রকৃতি ও তার বিপুল প্রবাহকে যেমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তেমনি সেই সকল ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত নর-নারীর হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের কথাও অনুভব করেন এবং নাটকে সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক তথ্য বা উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁর মতে ঐতিহাসিক নাটক যেহেতু নাটকই , কেবলমাত্র ইতিহাস নয়, সেজন্য 'ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য'— এই উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করা সম্ভব হলেই উন্নতমানের ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব।



আসুন জেনে নিই—

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসের একটি বিশেষ রস-সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতিই ঔপন্যাসিকের লোভ --- তাহার

সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই"। রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নাট্যকার শুধু ইতিহাসের শুকনো তথ্য তুলে ধরেন না, বরং ইতিহাস-বৃন্তে মানব-জীবনের ফুল ফোটাতে চান, সেজন্য নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে আবশ্যক মতো গ্রহণ-বর্জন করেন। এমনকি নতুন ঘটনা, আখ্যান বা দু-একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টির স্বাধীনতাও তাঁর আছে। ঐতিহাসিক নাটক-রচয়িতা তাঁর রচনায় প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি অবশ্যই ইতিহাসের পাতা থেকে নেবেন, কিন্তু এমন ভাবে চরিত্রগুলিকে তিনি নাটকে ফুটিয়ে তুলবেন যাতে তা ইতিহাসের অবিকল নকল হবে না। মোটকথা ইতিহাসের পরিচয় মোটামুটিভাবে রক্ষা করে সেই চরিত্রে ইতিহাসে নাবলা বা সামান্য বলা মানবিক পরিচয়কে মুখ্য করে ইতিহাস ও মানবজীবনের সমন্বয় সাধন করতে হবে নাট্যকারকে। এ-ছাড়া, যে-কাল বা যুগের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটকটি রচিত, সেই কালের রীতি-নীতি, প্রথা, আদর্শ অর্থাৎ সে যুগের সমগ্র পরিমণ্ডলটিকেও রচনা করতে হবে।

ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে এইসব সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি মনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটক বিচার করতে গেলে আমরা দেখব তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় কী আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের মূল কাহিনি হল মোগল সম্রাট সাজাহানের শেষ বয়সে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে চার পুত্রের মধ্যে বিরোধ এবং বিরোধের ফলে ঔরংজীবের হাতে দারা ও মোরাদের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং সুজার নির্বাসন আর এইসব ভয়াবহ ঘটনায় বৃদ্ধ, অসহায় সম্রাট সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিলাপ।

'সাজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে কতখানি অনুসরণ করেছেন, তা এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। যে কালের ইতিহাস নিয়ে নাটকটি লিখিত তা মোটামুটি এইরূপ ঃ ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালের ত্রিশ বছর পূর্ণ হল । ১৬৫৭ থেকে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত সাজাহানের রাজত্বকালের ঘটনাই এই নাটকের বিষয়। এই বছরেই (২৪ জানুয়ারি, ১৬৫৭) সম্রাটের সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হয় এবং ওই বছরেই সাজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় রাজ্যে গুজব রটে যায় যে সম্রাট সাজাহানের মৃত্যু হয়েছে । সাজাহানকে তখন শয়ন কক্ষের জানালা থেকে দাঁড়িয়ে প্রজাদের দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে হল যে তিনি জীবিত। এদিকে অসুখ ক্রমশ বাড়তেই থাকল। মৃত্যু আসন্ন জেনে সাজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে রাজধানী দিল্লি ছেড়ে আগ্রায় বাস করতে শুরু করলেন। কারণ আগ্রায় তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের সমাধি আছে। সাজাহানের চার পুত্রের মধ্যে দারা পিতার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিতার অসুস্থতার সময় তিনি আগ্রায় পিতার কাছেই থাকতেন। সাজাহানের অন্য পুত্রেরা অর্থাৎ ঔরংজীব, সুজা ও মোরাদ কেউই দারার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। সম্রাট সাজাহান আসলে জীবিত নেই এবং সিংহাসনের

লোভে দারা এ-সংবাদ গোপন করছেন— এরূপ অনুমানে তিনপুত্র বিদ্রোহ করলেন। এর জন্য দারার দায়িত্বও কম ছিল না। সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদ ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে। রাজধানীর কোনো চিঠিপত্র যাতে তাঁদের হাতে না পড়ে, দারা সুকৌশলে সে ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সংশয় বেড়ে গেল। সাজাহানের মৃত্যু সংক্রান্ত গুজবটি অতিরঞ্জিত হয়ে সুজা, ঔরংজীব, মোরাদের কাছে পৌঁছাতে লাগল। সাজাহানের এক কন্যা রৌশনারা এতে ইন্ধন জোগালেন। কারণ রৌশনারা ছিলেন ঔরংজীবের পক্ষে এবং দারাকে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। এসবের ফলে সিংহাসনলোভী তিনপুত্র সৈন্যদল নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রা করলেন। তারপরেই শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম। এই ঘটনাবৃত্তই 'সাজাহান' নাটকের মূল কাঠামো রচনা করেছে।

'সাজাহান' নাটকের ঘটনাকাল প্রায় আট বছরের। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর— ডিসেম্বর মাস থেকে সাজাহান নাটকের ঘটনা শুরু হয়েছে, নাটক শেষ হয়েছে সাজাহানের মৃত্যুর কিছুকাল আগে (১৬৬৬)। 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথমেই সাজাহান, দারা ও জাহানারার কথোপকথনের মধ্যে সেই সময়ের রাজনৈতিক সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে। সম্রাট সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের দমনের ভার দিলেন দারার উপর। সুজাকে দমন করার জন্য পাঠানো হল জয়সিংহ ও দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমানকে। ঔরংজীবের বিরুদ্ধে পাঠানো হল রাজা যশোবন্ত সিংহকে এবং মোরাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হল কাশিম খাঁকে। ইতিহাসের এই ঘটনাগুলি এবং তার পরিণতি নাটকে যথার্থ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। জয়সিংহ ও সোলেমানের হাতে কাশীর সুজা পরাস্ত হয়ে সপরিবারে পলায়ন করলেন (১৬৫৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি)। অন্যদিকে মোরাদ ও ঔরংজীব জয়ী হলেন (১৬৫৫ সালের ১৫ ই এপ্রিল)। দারা কিছুদিনের মধ্যে আবার ঔরংজীব ও মোরাদের সম্মিলিত শক্তিকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ঔরংজীবরা সেই যুদ্ধেও বিজয়ী হন (১৬৫৫ সালের ২৯ মে)। সেই বছরের ৫ জুনে ঔরংজীব আগ্রায় প্রবেশ করে দুর্গ অধিকার করেন এবং পুত্র মহম্মদের প্রহরায় পিতা সাজাহানকে বন্দী করলেন। এরপর ঔরংজীব মোরাদকে বন্দী করেন এবং দুবছর কারাবাসের পর ঔরংজীবের আদেশে মোরাদকে হত্যা করা হল। অন্য ভাই সুজা ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (১৬৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি) দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সাজাহানের প্রিয় পুত্র দারাও সপরিবারে পালিয়ে যান এবং আজমীরের কাছাকাছি দেওরয়ে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধেও দারা পরাজিত হন। বোলান গিরিপথ দিয়ে পালানোর সময় যে জিহন খাঁকে একদিন দারা প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন সেই জিহন খাঁ-ই পুরস্কারের লোভে দারাকে ঔরংজীবের কাছে ধরিয়ে দিলেন। সেটা ১৬৫৯ সালের ৯ই জুন। ঔরংজীবের আদেশে দারাকে হত্যা করা হল। দারার পুত্র সোলেমানও পরে ধরা পড়েন এবং বিষ প্রয়োগে তাকেও হত্যা করা হয়। সবশেষে অত্যাচারী বিজয়ী ঔরংজীব সাজাহানের কাছে ক্ষমা চান এবং সম্রাট সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করেন।



আসুন জেনে নিই —

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই নাটক রচনা করেন তখন মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, দু-একটি প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের উপকরণ গৃহীত হয়েছে প্রধানত ট্যাভার্নিয়ার, বোর্নিয়ার ও মানুচির কাহিনি থেকে। টডের 'রাজস্থান' কাহিনির থেকেও তিনি উপকরণ গ্রহণ করেছেন।



কাফের ঃ মুসলমানেরকাছে ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী, বিধর্মী এবং নাস্তিক মানুষ।

ইতিহাসে বর্ণিত এই সকল ঘটনাকে নাট্যকার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। ঔরংজীবের বিজয়লাভের কথা, তাঁর হাতে পিতার বন্দীদশা, মোরাদ ও দারাকে হত্যা, সোলেমানের হত্যা— সমস্তই ঐতিহাসিক ঘটনা, কেবল শেষ দৃশ্যে সাজাহানের কাছে ঔরংজীবের ক্ষমা প্রার্থনার দৃশ্যটি ছাড়া। সাজাহানের চার পুত্রকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেভাবে তুলে ধরেছেন তাও ইতিহাস সম্মত। ইতিহাসে আছে দারাকে ঔরংজীব ***কাফের*** মনে করতেন। দুই ভাইয়ের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। দারা ছিলেন পিতৃভক্ত। সন্তান ও পত্নীর প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রেম ছিল। সুজা ছিলেন সংগীত প্রিয় এবং বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। দ্বিজেন্দ্রলাল সুজাকে সে ভাবেই নাটকে এঁকেছেন। ইতিহাসে আছে ঔরংজীব ছিলেন সাহসী এবং কূটকৌশলী। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ ছিলেন মোরাদ। মোরাদ ছিলেন নির্বোধ ও আরামপ্রিয়। ফলে বুদ্ধিমান ঔরংজীব সহজেই তাঁকে শিকারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। দেখা যাচ্ছে চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। শুধু দিলদার ও পিয়ারা চরিত্র দুটি কাল্পনিক। দারা চরিত্রের প্রতি বেশি সহানুভূতি থাকার জন্য নাট্যকার তাঁর চরিত্রের ভালো দিকগুলিরই পরিচয় বেশি দিয়েছেন। জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়ার চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের ইতিহাস-চেতনা ও কল্পনা দুই-ই কাজ করেছে। জাহানারার চরিত্রটিও ঐতিহাসিক, তাবে ঔরংজীবকে ক্ষমার প্রসঙ্গটি ইতিহাসে নেই। নাটকে আছে প্রকাশ্য দরবারে জাহানারা ঔরংজীবকে অভিযোগ করেছেন এবং ঔরংজীবও কৌশলে সভাসদদের নিজের পক্ষে টেনে এনেছেন— এই দৃশ্যটির মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব থাকলেও ঐতিহাসিক নয়।

এতক্ষণের আলোচনায় আপনারা জানলেন যে 'সাজাহান' নাটক ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই ইতিহাসের নাবলা কথা বা সামান্য বলা মানবিক পরিচয়কে নাটকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসে যেমন সাজাহানের সম্রাট সত্তার কথা বিশদ ভাবে আলোচিত, দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে সাজাহানের পিতৃসত্তাকে বড় করে দেখিয়েছেন কারণ সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ এবং সেই সূত্রে পিতা সাজাহানের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে ফুটিয়ে তোলাই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য। দারা, ঔরংজীব, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, জাহানারা প্রভৃতি প্রায় সব চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার মানবজীবনের চিরন্তন সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও যেজন্য এরা সব দ্বিজেন্দ্রলালেরই সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এখানেই

যে তিনি একই সঙ্গে ইতিহাসের দাবি এবং নাটকের দাবি মেটাতে পেরেছেন। নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের কিছু কিছু নতুন সংযোজন এবং কিছু অদলবদল হওয়ার কথা মনে রেখেই বলা যায় 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ বন্দী সাজাহানের প্রহরায় কে ছিলেন?

ক. জয়সিংহ খ. সোলেমান

গ. মহম্মদ ঘ. কাশিম খাঁ

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ দারাকে ঔরংজীবের কাছে কে ধরিয়ে দিয়েছিল?

ক. যশোবন্ত সিংহ খ. রৌশনারা

গ. দিলদার ঘ. জিহন খাঁ

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ পিয়ারা কাল্পনিক চরিত্র — সত্য/মিথ্যা

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ সোলেমানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল — সত্য/মিথ্যা

.....

৯.৫ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক বিচার ও নামকরণ

'সাজাহান' নাটকটির নায়ক কে এবং এর নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না— এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। প্রখ্যাত সমালোচক সুকুমার সেন মনে করেছেন এই নাটকে ট্র্যাজেডি সাজাহানের জীবনে ঘটেনি, সুতরাং এই নাটকের নায়ক সাজাহান নয়। তাঁর মতে নাটকটির নাম 'সাজাহান' না হয়ে 'জাহানারা' হলেই ভালো হত। আরেক সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ মনে করেন নাটকটির নায়ক ঔরংজীব। আবার সমালোচক ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং রথীন্দ্রনাথ রায় স্পষ্ট মত দিয়েছেন যে এই নাটকের নায়ক সাজাহানই। আমরাও তা ই মনে করি।

আপনারা একথা মনে রাখবেন যে, নাটকের কাহিনির কেন্দ্রস্থলে যে চরিত্র থাকে, যাকে ঘিরে নাটকের সমস্ত ঘটনা পরিচালিত হয় এবং যার প্রয়োজনেই অন্যান্য চরিত্র নাটকে আসে -- সেই চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেই চরিত্রটিই নাটকের নায়ক। তার নামেই বা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ভাবটিকে আশ্রয় করে নাটকের নামকরণ করা হয়। 'সাজাহান' নাটকটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, দারার জীবনকাহিনি অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী হলেও দারার মৃত্যু কাহিনিকে উপস্থাপিত করার জন্য এ-নাটক লেখা হয়নি। এই নাটকে সম্রাট পক্ষের দারা যেমন আছে, তেমনি মোরাদ ও সুজাও আছে তাদের নিজস্ব কাহিনি নিয়ে। কিন্তু

নাট্যকারের মূল পরিকল্পনা তাঁরা নন। এমনকি দারাও সম্রাট সাজাহানের নির্দেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত। দারার মৃত্যু সাজাহানের দুঃখকে বাড়িয়েছে, কিন্তু দারা এই নাটকের প্রধান চরিত্র নয়।

জাহানারা নাটকের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। পুত্রস্নেহে দুর্বল পিতা সাজাহানকে জাহানারা বারবার বিদ্রোহীপুত্রকে দমন করতে উদ্দীপ্ত করেছেন। জাহানারা তেজস্বিনী নারী। ধূর্ত ঔরংজীবকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করতে জাহানারা ভয় পাননি। অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে পিতাকে রক্ষা করতে মাঝে মাঝেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর কথায় সাজাহান দারাকে বিদ্রোহ-দমনে অনুমতি দেন। তারপর দারা যুদ্ধ করেন এবং তার পরিণতিতেই দারার মৃত্যু হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাজাহান ও দারার ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে জাহানারার পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। তবু আমরা বলব যে, জাহানারা এ-নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, কারণ তাঁকে ঘিরে নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়নি। কিছুতেই এই নাটকের নাম 'জাহানারা' হতে পারে না।

নাটকে ঔরংজীবের চরিত্রই সবচেয়ে সক্রিয়। নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়েই তিনি আছেন। তাঁর চরিত্রে একদিকে আছে লোভ, নিষ্ঠুরতা, ছলনা, আবার অন্যদিকে আছে বীরত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, কর্মতৎপরতা। দোর্দণ্ড প্রতাপ ঔরংজীবের চরিত্রের একটা অন্য দিকের আভাস আমরা পাই একেবারে শেষে, পিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দৃশ্যে। নাট্যকার ঔরংজীবের চরিত্রের কলঙ্ক যেন একটু মুছতে চাইলেন শেষের দিকে। কিন্তু ঔরংজীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে কখনো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি। ক্ষমা চাওয়ার দৃশ্যেও কারুণ্যের সৃষ্টি হয় না। নায়ক হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঔরংজীবকে নাটকের নায়ক বলা যায় না। সাজাহানই এই নাটকের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্বই নাটকের মূল বিষয়। তাঁরই আদেশে দারা বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হন, যার পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দারার প্রত্যেকটি পরাজয় এবং ঔরংজীবের জয়ে হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন সাজাহান। দুর্বল হলেও উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতে নিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে দুষ্টপুত্র ঔরংজীবের প্রতিও তিনি স্নেহশীল। সবকিছু মিলে তাঁর অন্তর্জীবনটি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বারেবারে। সাজাহানের নিষ্ক্রিয়তা নাটকের ঘটনাকে শিথিল করেনি বরং সচলই করেছে। নায়কের সক্রিয়তা শুধু শারীরিক তো নয়, তা মানসিক ও আত্মিকও। সেদিক থেকে দেখলে সাজাহান চরিত্রটি যথেষ্ট সক্রিয় । সাজাহানকে ঘিরেই নাট্য-কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এজন্য সাজাহানই এই নাটকের নায়ক। নাটকের নামকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল শেকস্‌পীয়রকে অনুসরণ করেছেন, কারণ শেকস্‌পীয়রের প্রধান ট্র্যাজেডি গুলিতে মূলত নায়কের নামানুসারেই নাটকের নামকরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও নায়ক সাজাহানের নামেই নাটকের নাম রেখেছেন 'সাজাহান'। নামকরণটি যে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ সাজাহান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় চরিত্র। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক কি ঔরংজীব? (হাঁ/না)

.....

৯.৬ 'সাজাহান' নাটকের সংগীত ও সংলাপ

গ্রিক নাটকে কোরাস (Chorus) বা সমবেত সংগীতের বিশেষ মূল্য ছিল। সংগীত ছিল নাটকের অন্যতম উপাদান। নাটকে সংগীত ব্যবহারের একাধিক কারণ থাকতে পারে। সার্থক নাট্য সংগীত নাটকের মূল ভাবকেই প্রকাশ করে। নাটকীয় সংগীত নাটকীয় চরিত্র বিকাশের সহায়তা করে। অনেক সময় সংলাপ বা ডায়লগের মধ্যদিয়েও যা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, সংগীতের মধ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

আপনারা স্মরণ করুন, ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাট্যকার ছিলেন না, তিনি কবি, সংগীতজ্ঞ, সুরকার এবং একজন সুদক্ষ গায়কও ছিলেন। সংগীত রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পৃথকভাবে তাঁর অধিকাংশ গানেরও উচ্চমূল্য আছে।



আসুন জেনে নিই —

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন সেকালের সুবিখ্যাত গায়ক। বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীত রচনা ও সেই সংগীতে সুর সংযোগ করেছেন । তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) এর গানগুলি বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে লেখা। বিলাতে থাকাকালীন তিনি বিলাতি সংগীতের চর্চাও করেছিলেন।

'সাজাহান' নাটকে মোট নয়টি গান আছে। তারমধ্যে সাতটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা, বাকি দুটি গান প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গীতি -- একটি কবি জ্ঞানদাসের আর একটি কবি চন্ডীদাসের রচিত। এরমধ্যে পাঁচটি গানই পিয়ারার। মোরাদের নর্তকী ও কাশ্মীরের নর্তকীদের গান দুটি । বাকি দুটি গান যোধপুরের চারণ-চারণীদের।

আমরা আগেই বলেছি যে পিয়ারা চরিত্রকে সম্পূর্ণ রূপে নিজের স্বাধীনতায় গড়ে তুলেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। পিয়ারার প্রত্যেক কথায় যেমন আছে পরিহাস, তেমনি কথায় কথায় তার গান। গানের মধ্য দিয়েই পিয়ারার চরিত্রটি অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে। পিয়ারার 'এ জীবনে মিটিল না সাধ ভালোবাসি', 'আমি সারা সকালটি বসে বসে' 'তোমার হৃদয়খানি' প্রভৃতি গানে তার ভালোবাসার এবং সুখ দুঃখ বেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

মহামায়া চরিত্র অবলম্বন করে রাজপুত ইতিহাসের যে কাহিনি নাটকে আছে, তার প্রধান আকর্ষণ দেশপ্রেম মূলক সংগীত। তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে মহামায়ার আদেশে চারণ বালকেরা বিখ্যাত 'আমার জন্মভূমি' গানটি গেয়েছে। কবিতা ও গান হিসাবে 'আমার জন্মভূমি' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সংগীত। কিন্তু 'সাজাহান' নাটকে সংগীতটি যেভাবে সংযোজিত

হয়েছে তাতে তার নাট্যমূল্যও কম নয়। মোটকথা, 'সাজাহান' নাটকের গানগুলিতে সুরকার, গীতকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে।

সংলাপ বা ডায়লগ (Dialogue) নাটকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ বক্তৃতাধর্মী ও অলংকারমন্ডিত। সংগীতময়তা যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার জনপ্রিয়তার কারণ, তেমনি তাঁর সংলাপের একটা ত্রুটিও বটে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপের মধ্যে গঠনরীতিগত ত্রুটিও আছে, 'সাজাহান' নাটকের সংলাপেই যা স্পষ্ট হয়েছে। ইংরেজি বাগ্বিধির অতিরিক্ত অনুসরণের ফলে সংলাপের ভাষা অনেকসময় বাংলা বুলির নিজস্বতা হারিয়ে ইংরেজি-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর নাটকের সকল চরিত্রই প্রায় একই ভাষায় কথা বলে। অথচ এমনটি হওয়া স্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য সংলাপ খুব জোরালো— এই ভাষা রণভূমির ভাষা, বীরের ভাষা। কিন্তু সর্বত্র এই একই ভাষা ব্যবহার করার ফলে সংলাপ মাঝে মাঝেই কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। বেশি অলংকারের ব্যবহারের জন্যও নাট্যসংলাপ কৃত্রিম হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে চরিত্রের এককভাষণ (monologue) উল্লেখযোগ্য। যখন কোনো চরিত্র সামনে বা আশে-পাশে নেই, সেই নির্জনতায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। অপরের সামনে যা প্রকাশ করা যায় না তা একলা থাকার অবকাশে একক উক্তিতে ফুটে উঠতে পারে। এ-অবস্থায় পার্শ্ববর্তী চরিত্র না থাকলেও এই জাতীয় উক্তি বা একাত্মভাষণ দর্শকরা ঠিক শুনতে পান। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে কৌশলী ঔরংজীবের 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন'। ঝড় উঠবে..... ' সংলাপটি লক্ষণীয়। এ-জাতীয় সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৭ ঃ সমগ্র নাটক জুড়েই সাজাহান উপস্থিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ 'আমার জন্মভূমি' গানটি গেয়েছেন।

(ক) পিয়ারা (খ) চারণবালক (গ) মোরাদের নর্তকী (ঘ) কাশ্মীরের নর্তকী।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা গান।

(ক) ৪ টি (খ) ৫ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ৭ টি

.....



৯.৭ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ে আমরা 'সাজাহান' নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা রক্ষিত হয়েছে— এ বিষয়ে আপনারা বিশদভাবে জানতে পারলেন। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে নাট্যকারের কল্পনার মিশ্রণেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়, কেবল ইতিহাসের তথ্য তুলে ধরা নাট্যকারের কাজ নয়।
- 'সাজাহান' নাটকের নায়ক ও নামকরণ বিষয়েও আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই নাটকের নায়ক ও নামকরণ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও আপনারা এই অধ্যায়টি পাঠ করে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, দারা, ঔরংজীব বা অন্য কেউ নয়, সাজাহানই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সাজাহানকে ঘিরেই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গত কারণেই নায়ক সাজাহানের নামে নাটকের নামকরণ করেছেন।
- এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনারা 'সাজাহান' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধেও জানতে পারলেন। শেকস্‌পীয়রের 'কিং লিয়র' 'রিচার্ড দি থার্ড' ' অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি নাটকের প্রভাব কোথায় কতখানি পড়েছে সে বিষয়েও আপনারা জানলেন। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধেও আপনারা অবগত হয়েছেন।



৯.৮ অতিরিক্ত পঠন

১) ঘোষ, অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস।*

২) ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাঃ) ; *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড।*

৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।*

৪) মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর; *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য।*

৫) রায়, রথীন্দ্রনাথ; *দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার।*

৯.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ না

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

৯.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'-এর সার্থকতা বিচার করুন ।

প্রশ্ন ২ ঃ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক কে? যুক্তিসহ আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ 'সাজাহান' নাটকের গানগুলি নাট্যকাহিনিতে অপরিহার্য ছিল কি? আলোচ্য নাটকের সংগীত সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতা বিচার করুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব বিচার করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ 'সাজাহান' নাটকে সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তা — এই দু'য়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে সাজাহান চরিত্র কীভাবে গড়ে উঠেছে হয়েছে তার বর্ণনা দিন।

*** ***** ***

অধ্যায় ১০ ঃ সাজাহান — ২

অধ্যায়-বিন্যাস

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১০.২ পরিচিতি

১০.৩ সাজাহান নাটকের চরিত্র-বিচার

১০.৩.১ মুখ্য চরিত্র

১০.৩.২ গৌণ চরিত্র

১০.৪ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১০.৫ অতিরিক্ত পঠন

১০.৬ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১০.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা পাওয়া যায় এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের প্রকৃত নায়ক কে, এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সংগীত বিষয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে গভীর ভাবে বুঝতে এবং বিচার করতে পারবেন।
- নাট্যকাহিনিতে চরিত্রগুলির ভূমিকা তথা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।
- চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৫.২ পরিচিতি

পূরবর্তী অধ্যায়টিতে প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন ও সাহিত্যকৃতি এবং ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহানে'র কিছু দিশের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়া হল। নাটকের মুখ্য ও গৌণ কয়েকটি চরিত্র বিষয়ে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ চরিত্রই নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্রকে ভালোভাবে না বুঝলে নাটককেও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যাবে না। প্রথমে আমরা প্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা করে তারপর অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশেষভাবে একথা উল্লেখের প্রয়োজন, আপনারা মূল নাটকটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। পড়লে আনন্দ পাবেন।

১০.৩ 'সাজাহান' নাটকের চরিত্র-বিচার

পাত্র-প্রাত্রী নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্রকে ভালোভাবে না বুঝলে নাটককেও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। এই অনুচ্ছেদে 'সাজাহান' নাটকের প্রধান ও অপ্রধান সব চরিত্রের সঙ্গে আপনাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হবে।

১০.৩.১মুখ্য চরিত্র

➢ *সাজাহান ঃ* 'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের নায়ক সাজাহান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সু-অঙ্কিত চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসের উপাদানকে যথাযথ রেখে মানুষ সাজাহানের অন্তরের দুঃখ-বেদনা, যন্ত্রণাকে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাজাহান' নাটকের কাহিনি সম্রাট সাজাহানের জীবনের শেষ পাঁচ বছরের কাহিনি। এই সময় অসুস্থ সাজাহানের মৃত্যুর মিথ্যা রটনায় তাঁর চার পুত্রের মধ্যে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যে বিরোধ দেখা দেয় তা পিতা সাজাহানকে কীভাবে যন্ত্রণায় দগ্ধ করে তা-ই সাজাহান - চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।



আসুন জেনে নিই—

'সাজাহান' নাটকের চরিত্রলিপি অনুযায়ী পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র মিলিয়ে নাটকে মোট ষোলটি চরিত্র আছে। এ-ছাড়াও 'কুশীলব' তালিকায় স্থান নেই এমন কয়েকটি ছোট ছোট চরিত্রও নাটকে আছে, যেমন দিলীর খাঁ, সাহানাবাজ, জিহন খাঁ প্রমুখ।

সাজাহান যেমন দিল্লির সম্রাট, তেমনি আবার স্নেহবৎসল পিতাও। তাঁর অত্যধিক পুত্রস্নেহের জন্যই যখন বিদ্রোহী পুত্রদের যুদ্ধের মাধ্যমে শাসন করার সময় আসে তখন তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুত্র যেমনই হোক, পিতা সাজাহান যে সব পুত্রকে একই দৃষ্টিতে দেখেন। চার পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে সাজাহানের পিতৃহৃদয় তাই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলেছে ঃ ' এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি'। পুত্রস্নেহ সম্রাটের কর্তব্য পালনে তাঁকে বাধা দিচ্ছে কি না, তার হৃদয়ের দুর্বলতা তাঁর সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে কি না— এইসব ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সাজাহান চরিত্রটি আলোড়িত হয়েছে। তাঁর স্নেহ-দুর্বলতা সম্রাটের দায়িত্ব-কর্তব্যকে বারবার ছাপিয়ে ওঠায় সাজাহানের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। আমরা জানি সাজাহান ছিলেন সৌন্দর্যরসিক। শিল্প-কলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বাবর থেকে ঔরংজীব — অন্যান্য সব মোগল সম্রাটের

থেকে এক্ষেত্রে সাজাহান ছিলেন আলাদা। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ এবং পুত্র-কন্যাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন সাজাহান। অথচ সেই সাজাহানই বৃদ্ধ বয়সে নিজের পুত্রের হাতে নিজেরই দুর্গে বন্দী হয়ে রইলেন।

বাইরের দিক থেকে সরল মনে হলেও সাজাহান চরিত্রের মধ্যে জটিলতা কম নয়। একদিকে তাঁর মধ্যে আছে পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে দুজন পিতার সংঘাতও আছে। একদিকে তিনি দারা, সুজা, মোরাদ ও জাহানারার পিতা আবার তিনি তো ঔরংজীবেরও পিতা। ঔরংজীবকে কপট, ধূর্ত, মিথ্যাবাদী বলে বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না। পুত্রের জন্য পিতা সাজাহান মনে আঘাত পান, লজ্জিত হন, আবার ঔরংজীবের শৌর্য, বীর্য, বিচক্ষণতা দেখে পিতা হিসাবে তাঁর বুক ফুলে ওঠে। ফলে সাজাহানের মধ্যে দুই পিতার সংঘাত প্রবল হয়ে ওঠে। এই দুই পিতা ও সম্রাটের ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে বার বার সাজাহানের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তাঁর পিতৃহৃদয়ের এই দুর্বলতাই তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ি। যে পুত্রকে তিনি শুধু প্রশ্রয় দিয়েছেন, কোনোদিন শাসন করেননি, সেই ধূর্ত, লোভী পুত্র ঔরংজীবই সাজাহানকে বন্দী করে রেখেছেন। ঔরংজীবের হাতে তাঁর প্রিয় পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুও সাজাহানকে চোখের সামনে দেখতে হয়। তাঁর সম্রাট সত্তা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে ' আমি সম্রাট সাজাহান' বলে। কিন্তু বৃদ্ধ অশক্ত সাজাহানের পক্ষে তখন আর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। সাজাহানের পিতৃহৃদয় কেঁদে উঠে বলে ঃ " পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না। বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, ... তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর .....।"

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে হতে সাজাহান ধীরে ধীরে উন্মত্ততার দিকে এগিয়ে যান। নাটকের প্রথম থেকেই আমরা সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানে দ্বন্দ্ব দেখেছি। নাটকের শেষের দিকে এসে দেখি দারা, সুজা, মোরাদের পিতা সাজাহান ও ঔরংজীবের পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্ব। এত বড় অত্যাচারী পুত্রকেও ক্ষমা করতে চান সাজাহান, আবার ক্ষমা করলে দারা ও অন্যান্য পরমাত্মীয়দের হত্যাকারীকেই যে ক্ষমা করতে হয় --- এই দ্বন্দ্বে তাঁর অন্তর রক্তাক্ত হয়ে যায়। সাজাহান শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবকে ক্ষমা করলেন বটে কিন্তু ক্ষমা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

পিতা সাজাহানের কাছে সম্রাট সাজাহানের পরাজয়ের কাহিনি দিয়ে নাটকের সূত্রপাত এবং শেষও। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখি, পুত্রস্নেহবশত নিজে কোনো দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার পরিবর্তে দারা ও জাহানারার পরামর্শে বিদ্রোহী পুত্রদের শাসন করার জন্য দারার হাতে সম্রাটের পাঞ্জাটি তুলে দিয়েছেন। দৃঢ়স্বভাব ও কর্তব্যপরায়ণ হলে তিনি দারা ও জাহানারার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারতেন। আরেকটি কথাও আপনারা লক্ষ করবেন যে, দারাকে যে পিতা সর্বাপেক্ষা স্নেহ

করেন, অন্য পুত্রদের এটাও একটা ঈর্ষার কারণ ছিল। সাজাহান চরিত্রের এই সকল দোষ-ত্রুটি তাঁর করুণ পরিণতির জন্য দায়ি। নাটকে সাজাহানের করুণ জীবনকাহিনির যে পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়েছেন তা এক কথায় অসাধারণ।

- *ঔরংজীব ঃ* 'সাজাহান' নাটকের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র ঔরংজীব। নাটকের অপরাপর অনেক চরিত্রের পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঔরংজীব দায়ি। যেজন্য কোনো কোনো সমালোচক ঔরংজীবকেই এই নাটকের নায়ক বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঔরংজীবের চরিত্র অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে ঔরংজীব ছিলেন কৌশলী, চতুর, বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বশালী এবং ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া। মানুষ চেনার ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি যেমন তাঁর ছিল, তেমনি ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ ও নির্মমতা। 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবকে ঠিক এরকম ভাবেই আমরা দেখতে পাই।



আসুন জেনে নেই—

ঔরংজীবের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কূটকৌশল, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর 'Short History of Aurangzib' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ভিনিসীয় পর্যটক মানুচির গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

সাজাহানের পরে এই নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র নিঃসন্দেহে ঔরংজীব। অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবলের অধিকারী ঔরংজীব ছলে বলে কৌশলে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো কাজই ঔরংজীব করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্মম ও বিবেকহীন মানুষ। নিজের প্রয়োজনে ধর্মকেও বিকৃত ভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। সম্রাট হওয়ার জন্য তিনি এতটাই দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে পরম স্নেহময় বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করা, বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাইদের বন্দী ও পরে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার মতো কাজ করতেও তাঁর সামান্য দ্বিধা হয়নি। নাটকে আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছেন ঔরংজীব। স্বার্থপূরণের জন্য মিথ্যাচার, একটার পর একটা ষড়যন্ত্র এবং হত্যালীলা চালিয়ে গিয়েছেন ঔরংজীব।

সাজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারার একটি উক্তিতে ঔরংজীবের চরিত্রটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে ঃ "... বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই যে, মানুষ এমন হাসতে পারে— আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে, এমন মৃদু কথা কইতে পারে— যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে এমত হাত

জোড় কর্তে পারে— যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্ছে। বলিহারি।" এই ঔরংজীব কাউকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। নিজের পুত্র মহম্মদের সঙ্গেও ধূর্তামি করেছেন। পুত্রের প্রতি যে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন, সেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। কাজ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রকে বন্দী করে ঔরংজীব বলেছেন, "বেচারী পুত্র। কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।" কিন্তু এসবই তাঁর লোক ঠকানো কথা। নিজের স্বার্থে ধর্মকেও ব্যবহার করেছেন তিনি। দারাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে 'কাজীর বিচার' বলে প্রচার করেছেন। তাই দারার মৃত্যুর পর ঔরংজীব যখন বলেন, 'হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু ভাই পুত্র যাউক, ধর্ম প্রবল হউক'— সেটা যে তাঁর কপটতা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সক্রিয়তা, বলিষ্ঠতা, কর্মতৎপরতা ঔরংজীবের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য গুণ নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-সকল গুণই আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাঁর হৃদয়ে ক্ষত যদি কিছু থেকে থাকে তাও আমাদের চোখে পড়ে না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের শেষের দিকে ঔরংজীব চরিত্রের কলঙ্ক কিছুটা মোছার চেষ্টা করেছেন। ঔরংজীবের মধ্যে দু-একবার অন্তর্দ্বন্দ্বও আমরা দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঔরংজীবকে গভীরভাবে আলোড়িত করেনি। নাটকের একেবারে শেষদৃশ্যে সাজাহান, জাহানারাদের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কতটুকু আন্তরিক সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। চরিত্রটির প্রতি আমাদেরও তাই কখনো করুণা জাগে না। ঔরংজীব চরিত্রটি শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ নাটকের শেষে সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করে দেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ সাজাহান শারীরিকভাবেও নিষ্ক্রিয়, মানসিক ভাবেও নিষ্ক্রিয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ নাটকের শুরুতেই ঔরংজীবকে দমন করা জন্য সাজাহানকে প্ররোচিত করেন।

ক. দারা ও জাহানারা খ. দারা ও মোরাদ

গ. জাহানারা ও সুজা ঘ. জাহানারা ও জহরৎ

প্রশ্ন নং ৪ ঃ ঔরংজীব যথার্থই ধার্মিক ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ঔরংজীব নিষ্ক্রিয় ও অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ শেষ দৃশ্যে একমাত্র জহরৎ উন্নিসাই ঔরংজীবকে ক্ষমা করেননি। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ঔরংজীবের পুত্রের নাম

ক. মোরাদ খ. দিলদার

গ. সোলেমান ঘ. মহম্মদ সুলতান

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ ঔরংজীব সুজাকে

ক. ফাঁসি দেন খ. মুক্তি দেন

গ. নির্বাসিত করেন ঘ. সম্রাট করেন

.....

- *দারা ঃ* দারা সাজাহানের জ্যেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। সাজাহান দারাকেই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট মনোনীত করেছিলেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহান সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। দারার মৃত্যু নাটকে করুণ রস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে।

  দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস-অনুমোদিত রূপেই দারাকে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে দারা ছিলেন পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তান বৎসল পিতা ও পত্নী প্রেমিক স্বামী। দারা ছিলেন উদার মনের মানুষ। স্বভাবে তিনি ছিলেন ঔরংজীবের ঠিক বিপরীত। দুজনের সম্পর্ক ছিল খুব তিক্ত। ধর্মের ব্যাপারে ঔরংজীব ছিলেন ভীষণ গোঁড়া আর দারা ছিলেন ততটাই উদার। পণ্ডিতদের সহযোগিতায় দারা উপনিষদের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন। সুফিদের লেখা ও বেদান্ত সমানভাবে চর্চা করতেন তিনি। হিন্দু যোগী লালদাস ও মুসলমান ফকির সারমদ -- উভয়ের প্রতিই তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। নামাজ ও রোজাকে দারা তেমন আমল দিতেন না। এসব কারণে ঔরংজীব দারাকে 'কাফের' বলে উল্লেখ করেছেন। গোঁড়া ঔরংজীব দারার উদার মনোভাবকে সহ্য করতে পারতেন না। ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার দোহাই দিয়ে তিনি দারার প্রাণদণ্ড দেন। দারার পরধর্ম সহিষ্ণুতা, উদার মানসিকতা প্রভৃতি গুণাবলিকে প্রত্যক্ষভাবে নাটকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ নাট্যকারের ছিল না, তবে পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।



আসুন জেনে নিই—

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর "Short History of Aurangazib" গ্রন্থে দারার সম্পর্কে লিখেছেন "Dara was a loving husband, a doting father, and a devotd son."

নাটকে আমরা দারাকে দেখি সহৃদয় পুত্র, পিতা ও স্বামী হিসাবে। যুবরাজ হিসাবেও তিনি মানব-প্রেমিক, কিন্তু কুশলী শাসক নন। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। নাটকের প্রথম থেকেই দেখি যে, দারা প্রতিটি কাজ করেছেন পিতার অনুমতি নিয়ে, পিতার সন্তুষ্টির জন্য। দারা সাজাহানকে বলেছেন, "ভাববেন না পিতা, যে আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়। আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্তে"। এ সম্পূর্ণ সত্য। এই পিতৃভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছে। অন্য ভাইদের সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। ঔরংজীব, সুজা, মোরাদ উদ্ধত, লোভী, নির্মম ও কপট। আর দারা নির্লোভ, সজ্জন, বিদ্যানুরাগী ও সহানুভূতিশীল মানুষ। যুদ্ধের কূট কৌশল সরল মানুষ দারা জানেন না। যার জন্য বারবার ঔরংজীবের কাছে যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হয়েছেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য দারা সপরিবারে বোলান গিরিপথ দিয়ে পালানোর সময় ঔরংজীবের হাতে ধরা পড়েন। যে জিহন খাঁকে একদিন তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, পুরস্কারের লোভে সেই জিহন খাঁই তাঁকে ধরিয়ে দেয়। তারপর ঔরংজীবের আদেশে দারাকে হত্যা করা হয়। দারার পুত্র সোলেমানকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। দারার স্ত্রী নাদিরার অবশ্য ইতিপূর্বেই অর্ধাহারে-অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। জিহন খাঁর হাতে বন্দী হয়ে দারা বলেছেন, " আমি জানি জগতে সব --- সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ... আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি — শাঠ্য, পূজা --- খোসামোদ, কর্তব্য— জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে।" এই উক্তির মধ্যে দারার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। দারার করুণ জীবন-কাহিনি দর্শক-পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়।

নাট্যকার অসীম মমতায় দারাকে সৃষ্টি করেছেন। দারার প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি বশতঃ নাট্যকার তাঁর চরিত্রের ভালো দিকগুলিরই বেশি পরিচয় দিয়েছেন। দারা অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন অসংযমী, অহংকারী ও খেয়ালি। এ সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে নাট্যকার উল্লেখ করেননি। তা হলেও চরিত্রটি মানবীয় বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল। তা ছাড়া, নাটকে দারাকে too

good হিসাবে চিত্রিত করে, তাঁর দুঃখ ভোগকে ব্যক্তিত্বহীন ভালোমানুষের লাঞ্ছনার নমুনা হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে, যা করুণরসাত্মক (Pathetic) হয়েছে, কিন্তু ট্র্যাজিক নয়।

- *জাহানারা ঃ* 'সাজাহান' নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র জাহানারা। জাহানারা ব্যক্তিত্বময়ী এবং তেজস্বিনী নারী। নাটকের অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় জাহানারা অনেক বেশি সক্রিয় ও বলিষ্ঠ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার কথা ইতিহাসেও বর্ণিত হয়েছে। জাহানারা স্নেহ ও সমর্থন করতেন দারাকে এবং ঔরংজীবকে একেবারেই পছন্দ করতেন না।



আসুন জেনে নিই—

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর "Studies in Aurangzeb's Reign" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে জাহানারাকে "The Indian Antigone" বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশ্য দরবারে জাহানারার ঔরংজীবকে অভিযুক্ত করার ঘটনাটি অনৈতিহাসিক হলেও তার মধ্য দিয়ে জাহানারার প্রখর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও যুক্তিপূর্ণ বাচনভঙ্গি ফুটে উঠেছে। বুদ্ধি ও চাতুর্যেও জাহানারা অতুলনীয়। নাটকে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যেই তাঁর আর্বিভাব । কিন্তু এই অল্প পরিসরেও তাঁর চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখি তিনি স্নেহ দুর্বল পিতাকে বিদ্রোহী পুত্রদের দমনে উদ্দীপিত করেছেন, দ্বিধাগ্রস্ত দারাকে দ্রুত কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ার জন্য তিরস্কার করেছেন এবং নাদিরার হৃদয়ে গৌরববোধ জাগ্রত করেছেন। ঔরংজীবের জয়লাভে ক্রুদ্ধ জাহানারা বলেছেন, "আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী করব।" এহেন জাহানারার চরিত্রে নারী সুলভ রমণীয়তা ও স্নেহ-পরায়ণতার কথাও বিশেষভবে উল্লেখ করতে হয়। পিতা সাজাহানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অতি গভীর। সকল অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে জাহানারা সাজাহানকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। বন্দীদশায় জাহানারা পাশে না থাকলে সাজাহানের অবস্থা যে আরো করুণ হত তাতে সন্দেহ নেই। স্নেহ-মমতায়, করুণায়, সেবা-শুশ্রূষায় জাহানারা অতুলনীয়।

জাহানারার মমতাময়ী চরিত্রের মধ্যেও তার আত্মমর্যাদাবোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি পক্ষপাত লুকানো থাকেনি। কারাগারের মধ্যে অসহায় শিশুর মতো সাজাহানের ক্রন্দন জাহানারা সহ্য করতে পারেননি। ঘোর বিপদের সময় অত্যাচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে শুধু ঈশ্বরকে ডাকাও জাহানারা মেনে নিতে পারেননি। পিতাকে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিয়ে জাহানারা বলেছেন, " বাবা এই কারাগারের

কোণে বসে অসহায় শিশুর মতো ক্রন্দন করলে কিছুই হবে না। ..... উঠুন দলিত ভুজঙ্গের মতো ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃত শাবক ব্যাঘ্রীর মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন।" জাহানারা ঔরংজীবকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁকে 'ভণ্ড' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, আবার কৌশলে আমীর ওমরাহদের উত্তেজিত করেছেন ঔরংজীবের বিরুদ্ধে। ঔরংজীব ঠিক বুঝেছিলেন যে এহেন নারীকে বন্দী করে রাখলে তাঁর বিপদ ঘটবে। জাহানারা বীরাঙ্গনা। নারীসুলভ স্নেহ-মমতা, করুণা, ভালোবাসা সবগুণই তাঁর আছে। তেজস্বিতার সঙ্গে কোমলতার চমৎকার সম্মেলনে তাঁর চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৯ ঃ দারা একজন দক্ষ শাসক ও কুশলী যোদ্ধা ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ জিহন খাঁর হাতে দারা ধরা পড়েন—

ক. আজমীরে খ. বোলান গিরিপথে

গ. শামুগড়ের যুদ্ধে ঘ. আগ্রায়

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ দারা উপনিষদের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ দারার দুই পুত্র—

ক. মহম্মদ ও সিপার খ.মহম্মদ ও সোলেমান

গ. সিপার ও সোলেমান ঘ. সোলেমান ও দিলদার

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ পুরোনো শত্রুতার জন্য জিহন খাঁ দারাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ জাহানারার বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা ইতিহাসসম্মত। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ প্রকাশ্য দরবারে জাহানারার ঔরংজীবকে অভিযুক্ত করার ঘটনাটি। (সত্য/কাল্পনিক)

.....

১০.৩.২ অপ্রধান চরিত্র

➢ *দিলদার ঃ* 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রটি নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি । এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামত খাঁ হাজীর চরিত্রকে স্মরণে রেখে নাট্যকার এই চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। বিদ্বান এই পণ্ডিতকে নাট্যকার প্রথমে মোরাদের বিদূষকরূপে দেখিয়েছেন। পরে দিলদার রাজনৈতিক আবর্তে ঢুকে গেছেন।



আসুন জেনে নিই—

'সাজাহান' নাটকে 'কুশীলব' প্রসঙ্গে দিলদারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে— 'ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেসমন্দ)।' দিলদারের পরিচয়জ্ঞাপক 'দানেসমন্দ' শব্দটি ফার্সি 'দানিসবন্দ্' শব্দটির অপভ্রংশ বলে অনুমান করা যেতে পারে। ফার্সি শব্দটির অর্থ হল ধর্মপরায়ণ বা পুণ্যাত্মা। আবার, ইতিহাসে দানিশমন্দ খান নামটি দুর্লভ নয়। সুপণ্ডিত দানিশমন্দ খান ছিলেন পর্যটক বোর্নিয়ারের পৃষ্ঠপোষক।

দিলদারের রাজনৈতিক জ্ঞান অসাধারণ। ঔরংজীবের কাজের কঠোর সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। দারাকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দিলদার। যদিও তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। দিলদার জ্ঞানী, হাস্যরসিক, রাজনীতিক-জ্ঞান সম্পন্ন, মানবপ্রেমিক ও দার্শনিক। আপনারা লক্ষ করবেন, বিদূষক হলেও স্থূল হাস্যরস ও অতিরঞ্জিত ভাঁড়ামি দিলদার চরিত্রে নেই। দিলদারের হাস্যরসের মধ্যে আছে বাকচাতুর্য, শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি। আসলে, শুধু হাস্যরসই নয়, নাট্যঘটনার বিভিন্ন পর্বে নানা প্রয়োজনেই এ-চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা দিলদার ঔরংজীব, মোরাদ প্রভৃতি চরিত্রের বিবেককে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি কিছুটা সফলও হয়েছেন। হাস্যরস, সততা, মানবপ্রেম ও দার্শনিকতা নিয়ে দিলদার চরিত্রটি নাটকে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

➢ *পিয়ারা ঃ* ইতিহাসে সুজার দ্বিতীয় পক্ষের অভিজাত বংশীয়া এক স্ত্রীর উল্লেখমাত্রই আছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সেইটুকুমাত্রকে অবলম্বন করে এই চরিত্রকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। পিয়ারা পরিহাসরসিকা, প্রেমময়ী রূপসী নারী। সংগীতের সাধনায় পিয়ারা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। স্বামী সুজা তাঁর সম্পর্কে নাটকে বলেছেন, 'পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা — একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী।' সত্যিই তাই। স্থানে-অস্থানে সর্বত্রই তাঁর রসিকতা, হাসি-ঠাট্টা। আবার কথায় কথায় তিনি গানও করেন। যুদ্ধের ভয়ংকর পরিবেশেও পিয়ারা নির্বিকার মনে প্রেমের গান গেয়ে যান। সুজার জীবনের এক পরম সম্পদ এই নারী। যুদ্ধপ্রিয় সুজা সাম্রাজ্যের জন্য

লালায়িত হয়ে বারবার নিজের জীবনে বিপদ ডেকে আনেন। সুজার অস্থির জীবনের দুঃখ কষ্ট- যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেন পিয়ারা তাঁর গানের অমৃত-সুরায়। পিয়ারা চরিত্রটিকে গভীর ভাবে অনুধাবন করলে আপনারা দেখবেন যে হাস্য-পরিহাস ও সংগীতে দক্ষ পিয়ারার হৃদয়ের গভীরে কিন্তু কান্নার সমুদ্র বয়ে গেছে। স্বামীর জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। সুজাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন। আপনারা আরো লক্ষ করবেন যে পিয়ারার বাস্তবজ্ঞান প্রবল। স্বামীকে পর্যন্ত তিরস্কার করে একবার পিয়ারা বলেছেন, ' এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছ ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হেলে ধর্তে পার না, কেউটে ধর্তে যাও।' অর্থাৎ যে মানুষ একটি বিষহীন সাপ ধরতে পারেন না, তিনি চেষ্টা করছেন সবচেয়ে বিষধর কেউটে সাপ ধরবার।

প্রয়োজনে এই পিয়ারাই তেজস্বিনী নারীর রূপ ধারণ করেছেন। আরাকানরাজ তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে পিয়ারাকে চাইলে এই পিয়ারাই স্বামীকে ওই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন, সে যুদ্ধে তিনিও থাকবেন স্বামীর পাশে। সুজার ব্যক্তিগত জীবনে রাশ টেনে ধরেছেন তিনি। সুজার কাহিনিকে নাটকে পূর্ণতা দিয়েছেন পিয়ারা এবং অন্তিমে তাঁর নির্দেশে স্বামী ও তাঁর মৃত্যু মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ধর্ম ও বুদ্ধির সমন্বয়ে পিয়ারা চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিকল্পনাপ্রসূত এক অপরূপ সৃষ্টি।

- *জয়সিংহ ঃ* অপ্রধান চরিত্র হলেও নাট্যকাহিনির সঙ্গে জয়সিংহ চরিত্রটির গভীর যোগ আছে। জয়সিংহের স্বার্থপরচিন্তা ও বিশ্বাসঘাতকতা দারার পরাজয়কে যেমন নিশ্চিত করেছে, তেমনি সাজাহানের ট্রাজেডিকেও ঘনীভূত করেছে। জয়পুর বা বিকানিরের মহারাজা জয়সিংহ স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। তিনি সর্বক্ষণ ক্ষমতাবানকে তোষামোদ করে চলেন। ইতিহাসে যেমনভাবে আছে, ঠিক তেমনি ভাবেই চরিত্রটিকে নাট্যকার নাটকে তুলে ধরেছেন। জয়সিংহের নিজের একটি কথাতেই তাঁর চরিত্রট স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে ঃ "সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেখানেই যাবো"। নীতি, মায়া-মমতা, কৃতজ্ঞতা, করুণা— এসব কিছুর উপরে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাকে স্থান দেন। সোলেমানের সঙ্গে শঠতা বা দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে জয়সিংহ তাই দ্বিধা করেননি। জয়সিংহ চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীন ভারতের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি ইংরেজের খোশামোদকারীদের মূর্তিটিকে প্রকাশ করেছেন।
- *মহম্মদ ঃ* মহম্মদ সুলতান সম্রাট সাজাহানের পৌত্র এবং ঔরংজীবের পুত্র। মহম্মদ চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণতা ও পিতৃভক্তি। আমাদের মনে হয় ঔরংজীবের পিতৃভক্তিহীনতার বিপরীতে স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই মহম্মদের পিতৃভক্তিকে বেশি বড় করে দেখানো হয়েছে। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। পিতৃভক্তির সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে আছে সকলের জন্য প্রেম ও সহানুভূতি।

এই বিরল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে ভারত-সিংহাসন লাভের প্রলোভনকে জয় করে নিয়েছেন মহম্মদ। পিতৃভক্তিই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলেও আরো কিছু গুণও তাঁর আছে। মহম্মদ আদর্শবাদী। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ রক্ষার জন্য স্বয়ং পিতাকেই তিনি একবার বলেছিলেন, 'আপনি এই ভারত সাম্রাজ্য আজ পেয়েছেন বটে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য হারালেন— আমার পিতৃভক্তি।'

মহম্মদ সুলতান যে একজন বড় বীরও ছিলেন, তার পরিচয়ও নাটকে আছে। প্রেমের প্রতি তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান। সুজার কন্যা গুলরুখ বানুকে তিনি ভালোবেসেছেন এবং পিতার বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে গুলরুখ বানুকে বিবাহ করেন। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মহম্মদের এই প্রেমিকসত্তা তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যময় করে তুলেছে। অবশ্য তাঁর পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক। মহম্মদ বিবাহের পর সুজার পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু ঔরংজীবের কৌশলে আবার মোগল শিবিরে ফিরে আসেন। এই অপরাধে তাঁকে যাবজ্জীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হয়। ইতিহাস বলে, এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। যাহোক, প্রেম-প্রীতি, মানবিকতা, পিতৃভক্তি, বীরত্ব, ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট মহম্মদ চরিত্রটি সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে।

- *সোলেমান ঃ* মহম্মদ সুলতানের মতো সোলেমান চরিত্রটির প্রতিও আমাদের প্রীতি ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়। সোলেমান দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি যথার্থ বীর। পিতাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন। পিতার বিপদের সময় সেনাপতির পা ধরে সাহায্য ভিক্ষা করতেও সোলেমান দ্বিধা করেননি। প্রকৃত বীরের মতো শেষ শ্বাসটুকু থাকা অবধি তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সোলেমান চরিত্রের আর একটি গুণ যা আমাদের মুগ্ধ করে সে হল তাঁর নীতিবোধ। একমুহূর্তের জন্যও তিনি কখনো তাঁর আদর্শ থেকে সরে আসেন না। সুন্দরী বারাঙ্গনাদের প্রলোভন সহজে জয় করার মতো নৈতিক শক্তি তাঁর আছে। ভগিনী জহরৎ উন্নিসা পুরুষ বেশে ঔরংজীবকে হত্যা করতে এলে জহরৎ উন্নিসাকে বাধা দিয়ে সোলেমান বলেছেন, 'ক্ষান্ত হও — হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।' এই উক্তি থেকেই আদর্শবাদী সোলেমানের অন্তরটি আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে। অথচ এমন একটি মানুষকে ঔরংজীব গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে মাত্রাতিরিক্ত আফিম খাইয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।

আদর্শবাদ, পিতৃভক্তি, বীরত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট সোলেমান অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গুণাবলিকে বাড়িয়ে দেখাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রটিকে আদর্শ ও নীতির পুতুল বানিয়ে তুলেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই যেন মনে হয় না। তাঁর দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা অতিনাটকীয় হয়েছে। এককথায় নাটকে সোলেমান চরিত্রটি ঠিক যেন জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ দিলদার কার বিদূষক ছিলেন?

ক. ঔরংজীব খ. সাজাহান

গ. মোরাদ ঘ. সুজা

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে পিয়ারাকে চেয়েছিল—

ক. যশোবন্ত খ. জিহন খাঁ

গ. জয়সিংহ ঘ. আরাকান রাজ

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ জয়সিংহ কার সঙ্গে শঠতা করেছিলেন?

ক. জাহানারা খ. সোলেমান

গ. মোরাদ ঘ. মহম্মদ

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ মহম্মদের শ্বশুর—

ক. মোরাদ খ. সিপার

গ. সুজা ঘ. আরাকান রাজ

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ পিতাকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে সোলেমান কার পা ধরে সাহায্য চেয়েছিলেন?

ক. ঔরংজীব খ. সাজাহান

গ. জয়সিংহ ঘ. সেনাপতি

.....



১০.৪ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই আধ্যায়ে আমরা 'সাজাহান' নাটকের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। সাজাহান, ঔরংজীব, দারা ও জাহানারা— এই চারটি চরিত্রকে আমরা নাটকের প্রধান চরিত্র হিসাবে আলোচনা করেছি।
- এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এই চারটি চরিত্রই

নাট্যকাহিনিকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতার বিচারও আমরা করেছি।

- এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনারা একথাও জানতে পারলেন যে অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে দিলদার, জয়সিংহ, মহম্মদ ও সোলেমান একেবারে গৌণ চরিত্র নয়, কারণ নাট্যকাহিনির সঙ্গে এই চরিত্রগুলির নিবিড় যোগ আছে। এই চরিত্রগুলি এবং সেই সঙ্গে পিয়ারার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলিতে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি।



১০.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) ঘোষ, অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস।*
২) ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাঃ) ; *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড।*
৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।*
৪) মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর; *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য।*
৫) রায়, রথীন্দ্রনাথ; *দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার।*



১০.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ
৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ক
৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য
৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ
৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ
৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাল্পনিক

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

১০.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'সাজাহান' নাটক অনুসরণে ঔরংজীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দারা চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ 'সাজাহান' নাটক অনুসরণে জাহানারার ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার পরিচয় দিন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দিলদার চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল কি? যুক্তিসহ আপনার মতামত পরিস্ফুট করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ পিয়ারা চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব বিচার করুন।

প্রশ্ন ৬ ঃ মহম্মদ ও সোলেমান চরিত্র দুটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও আপন চারিত্রিক মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। — মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

প্রশ্ন ৭ ঃ টীকা লিখুন —

দিলদার, পিয়ারা, জয়সিংহ, মহম্মদ, সোলেমান

*** ***** ***

অধ্যায় ১১ ঃ *জীবনস্মৃতি* — ১

অধ্যায় বিন্যাস

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১১.২ পরিচিতি

১১.৩ গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচয়

১১.৪ *জীবনস্মৃতি* ঃ সাধারণ আলোচনা

১১.৫ ঘর ও বাহির — মূল পাঠ

১১.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১১.৬ ভৃত্যরাজক তন্ত্র —মূলপাঠ

১১.৬.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১১.৭ নানা বিদ্যার আয়োজন— মূলপাঠ

১১.৭.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১১.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

১১.৯ অতিরিক্ত গঠন

১১.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা জানবেন —

- *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের রচয়িতার জীবন সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন
- রবীন্দ্রনাথের শৈশবে আড়ম্বরহীন জীবন সম্পর্কে জানা যায়
- ঘরের মধ্যে থেকেও মানসিকভাবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মুক্ত হয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করা যায়
- না চাইতেই সব পেয়ে যায় বলে এখনকার ছেলেমেয়েরা অপব্যায় করে বেশি-এনিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ভৃত্যদের উপর রবীন্দ্রনাথদের ছেলেবেলার দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই শাসনের অধিকারও তাদের বেশি ছিল— এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে
- ভৃত্যদের স্বভাব এবং ছেলেদের প্রতি তাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যায়
- ঠাকুরবাড়িতে নানা ধরনের বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়, যেমন — গান, প্রাকৃতবিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, বেদবিদ্যা, ইংরেজি শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১১.১ পরিচিতি

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যর অন্তর্গত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথেৰ স্মৃতি কথা নিয়ে আলোচিত, গ্রন্থটিতে নানান অধ্যায়গুলোকে বিভিন্ন নাম দিয়ে সেই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থটির মাত্র ছয়টি অধ্যায় এখানে পাঠ্য হিসেবে গৃহীত।

বর্তমান অধ্যায়ে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'ঘর ও বাহির', 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' এবং 'নানা বিদ্যারে আয়োজন' সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। এই তিনটি রচনা অবলম্বণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের নানান স্মৃতিকথার পরিচয় দিয়েছেন। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, ভৃত্যদের শাসনের মাধ্য যে সব স্মৃতিগুলো রয়েছে তা তিনি এর মাধ্যমে প্রকাশ কয়েছেন। এবং একই সঙ্গে ছেলেবেলার নানান ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা সমন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩ গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয়

কলকাতা জোড়সাঁকো ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহন করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ছাপার অক্ষরে স্বনামে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলায় উপহার'। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তিনি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন, *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভূবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। *ভারতী* প্রত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস *করুণা* প্রকাশিত হয়। ২২-১২-১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রামের সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডর প্রতিবাদে ১৯১৯ এ তিনি তাঁর সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপধি ত্যাগ করেন। এইসময় বিখ্যাত ইংরাজ শিল্পী রোদেনষ্টাইন কবির *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং মে, সিনক্লেয়ায়, এজরা পাউণ্ড ইয়েটস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে এই কাব্য ও কবির পরিচয় করিয়ে দেন। নভেম্বয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে *গীতাঞ্জলি*-র ইংরাজি অনুবাদ বা *Song Offerings* প্রকাশিত হয়। অক্টোবর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলা ভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজস্র এবং অপূর্ব। তিনি একাধারে কবি,

দার্শনিক, শিক্ষাবিদ , সুরকার, নাট্য প্রযোজক এবং স্বদেশ প্রেমিক। এমনকি বিজ্ঞানেও তাঁর অশেষ আগ্রহের পরিচয় পাওয় যায় *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থে। ভারত ও বাঙলাদেশ এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রচয়িতারূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নাম পাওয়া যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্ম কত খৃষ্টাব্দে হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ রবীন্দ্রনাথ কত খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ *গীতাঞ্জলি* কাব্যের ইংরাজি অনুবাদটির নাম কী?

.....

১১.৪ *জীবনস্মৃতি*ঃ সাধারণ আলোচনা

জীবনস্মৃতি ১৯১২ রবীন্দ্রনাথের রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পটভূমিকা রয়েছে। এটি শুধু কবির তথ্যসংগত আত্মকথা নয়, এখানে রয়েছে কবিজীবনের উপাদান এবং পটভূমিকা। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে সমস্ত রচনায় কবি স্ফুটবাক হতে পারেননি, *জীবনস্মৃতি*তে ব্যাখ্যায় ছলে সেগুলিকে তিনি স্ফুটতর করেছেন। তা ছাড়াও প্রথম জীবনের যে সমস্ত স্মৃতির টুকরো কবির কাব্যজীবনের সহায়ক হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন এতে তারই কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে লেখক তাঁর স্মৃতিগুলোকে কিছু অধ্যায়ের মাধ্যমে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলোর মধ্যে আমাদের পাঠ্য অধ্যায়গুলো হলো— ঘর ও বাহির, ভৃত্যরাজক তন্ত্র, নানা বিদ্যার আয়োজন।

১১.৫ ঘর ও বাহির — মূল পাঠ

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটর উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লাইবার

জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা— সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর স্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎ-সামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম— কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবায় মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম; তাহাতে যাতায়তের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে, পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমাদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহু দূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘূ করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পন করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পূরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে-তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহিররাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাই, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা *রামায়ণে* পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীয়ের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বাট — দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি

খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলেয় উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পন করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য যা উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই- ধীরেসুস্থে স্থান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দূপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুনা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বেয় নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বাটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায় । যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারোদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন- কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বহিয় বলিয়া একটি অনন্ত- প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রুপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জালনার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা

করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে —

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটুবড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপয় কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর ইহতে এই খাঁচায় পাখির সঙ্গে ওই বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম- চোখে পড়িত আমাদের বাড়ি ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধায়ে যে তারা গয়লানী আমাদের দূধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত, তবুচূড়াব সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকাবেরও নানা আগতনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরোদ্রে প্রখর শূভ্রতা বিচ্ছূরিত করিয়া পূর্ব দিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইা চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছ। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রূদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাধার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দুরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ম

ডাক আসার কানে আসিয়া পৌছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সন্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত— তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘৰ বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি, হাত গলাইয়া ছিটকিনি টানিয়া, দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল— সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ- করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সন্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদর্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। এক দিকে মুক্তি, আর-এক দিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পূলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে; ভুলিয়া যায়, অনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে- বাগান ছিল তাহাকে ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া, এই ঢেঁকিশালাটি কোন্-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমেয় স্বর্গেদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন-আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে - পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে-পর্যন্ত মানুষের সাজ-সজ্জার

প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল- সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎ- কালের ভোরবেলায় ঘম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালর- গুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত- তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ, এখন দিদিয় সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহিরে, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই, তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজসেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে, একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনো মতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে।" সে বলিয়াছে, "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়। রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকুমাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কী আছে বলো দেখি।" কোনটা থাকা যে অসম্ভব, তাহা

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে, এ কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুকা জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম— তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বিলয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসরে যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গুহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুল-ঘরের কোণে যে পাহাড়সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী অকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত — মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি. মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারি ধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি— দেখিয়াছিল, গর্ত বড়ো হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্দুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়; কিন্তু, বৎসর গেল, সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দায় একটুখানি টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন- আমাদের মতো শিশুর

আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধেদয় পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিড়ির উপর সিড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আরো সিঁড়ি আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি"— শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাষ্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়।

১১.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে তাঁর জীবনের ছেলবেলার কিছু মুহূর্ত এবং কিছু অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির মত বংশে জন্মেও রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল খুব সাধারণ ভাবেই কেটেছে। পরিধান কিম্বা আহারে কোনোরকম আড়ম্বর ছিল না। ছেলেদের প্রতি অভিভাবকদের খুব বেশি নজর থাকত না। ছেলেরা বাড়ির চাকরদের হাতেই বড় হয়ে ওঠত। অভিভাবকদের কড়া শাসনের বন্ধনে জড়িত নাহওয়ায় তারা যেন একরকম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। অনাদরে লেখকরা স্বাধীনতার কিম্বা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কারণ খাওয়ানো পরাণো সাজানো-সোজানোর দ্বারা তাদের মনকে চারদিক থেকে আবদ্ধ থাকাতে হয়নি। গুরজনদের অনাদরে তারা নিজের ইচ্ছামত কল্পনার জগত এবং খেলার জগতকে সাজিয়ে নিতে পয়েছিলেন। তাদের জামায় একটা পকেট পর্যন্ত যেখানে তারা খুব সামান্য সম্পত্তিও জামিয়ে রাখতে পারে, সে সময়ে চটি জুতো আড়ম্বরতার প্রতীক হিসেবে ধরা হতো, কিন্তু দেখা যেত ঠাকুরবাড়ির বালকদের কাছে সেটা খেলার সামগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হত। চটি জুতোগুলিকে তারা যেখানে নিক্ষেপ করতেন সেমানে তারা পা দিতেন না। প্রতি পদক্ষেপে চটি জুতোকে আগে আগে রেখে চলতেন ফলে যাতায়াতের সময় তাদের পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনার বাহুল্যতা হতো। জুতার ব্যবহার তাদের কাছে একেবারে ব্যার্থ।

বর্তমান যুগে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই গুরুজনদের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যায় যা রবীন্দ্রনাথদের পক্ষে দুর্লভ ছিল। না চাইতেই সব সহজেই পেয়ে যায় বলে এখনকার ছেলেমেয়েরা অপব্যায় করে বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেয়ে যায় বলে খুব কম অংশই তারা কাজে লাগায় ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের

ভৃত্যরাই দেখাশোনা করতেন। তারা নিজেদের সুবিধায় জন্য বালকদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের একটি ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে তাদের চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিতেন। এবং মুখ গম্ভীর কয়ে তর্জনী তুলে বালকদের বলে যেতেন গণ্ডির বাইরে গেলে বিষম বিপদ। ঠাকুরবারিতে শ্যাম নামে এক ভৃত্য ছিল যে দুরন্ত ছেলেমেয়েদের বশ করতে তাদের ঘরবন্দী করে রাখতেন। ঘরের ভিতরে বন্দী থেকেও লেখকদের প্রাণের চাঞ্চল্য বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় কোনোমতেই বাধা পড়ত না। তারা জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন। লেখক ঘরের ভিতরে বন্দী অবস্থায় থেকে জানালা দিয়ে তাদের বাইরের দিকের পুকুর, পাশের বাগান গাছপালা প্রকৃতিকে অনুভব করতেন। সকাল থেকে পুকুরে প্রতিবেশিদের আনাগোনা, তাদের নিত্ত-নৈমিত্তিক কাজ, ক্রমে দুপুরে শূণ্য পুকুরের নিস্তব্ধতা, সেখানে রাজহাঁসদের বিচরণ গুগলি তুলে খাওয়া, এরপর বহুদিন পুরোণো বটগাছ, তার চারি দিকের ঝুরি ইত্যাদির মাধ্যমে লেখকের মানসচক্ষে দেখা বিভিন্ন কার্যকলাপ চলত। বন্দী ঘরে বসে বাইরের জগৎকে হাল্কা ভাবে দেখার মাধ্যমেই লেখকের কল্পনাশক্তির উদ্ভব হয়েছে। বন্ধনের মধ্যেই যেন তিনি মুক্তির স্বাদ পোয়ছিলেন। আড়ম্বরহীন এবং উপকরণ বিহীন জীবন লেখককে তার কবিত্ব শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে অনেক সাহায্য করেছে।

লেখকরা বাইরের জগতকে খুব কাছের থেকে না পেলেও বাইরের জগতকে মনের দিক থেকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বাইরের উপকরণ বেশি থাকলে সেগুলো নিয়েই হয়তো সময় কেটে যেত, কিন্তু যেহেতু বাইরের উপকরণ কম, তাই মনের দিকটি আর কুড়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মনের কাজ সেখানে আনক বেশি। লেখক মনকে দিয়ে নানান কল্পনা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন। ঠাকুরবাড়ির যে জায়গাগুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে থাকত, সেদিকে লেখকের নজর পড়ত বেশি, কারণ তাতে নিত্য প্রয়োজনের ছাপ থাকত না। কল্পনা এবং শিশুমনের রহস্যময়, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ ঘর ও বাইরের জগতকে এক ছন্দে মিলিয়ে দিয়েছেন। ঘরের গণ্ডী, গুরুজনদের শাসন সবকিছুর মধ্য দিয়ে অপ্রাপ্য, অস্পৃশ্য জিনিসগুলো তিনি কাল্পনিক ভাবে উপলব্ধি করেছেন।



আসুন জেনে নিই...

সীতার গণ্ডি ঃ *রামায়ণে* মারিচ নামে যে মায়াবি রাক্ষস সোনার হরিণ সেজে সীতাকে আকর্ষণ করেছিল, এবং রাম তাকে ধরতে গিয়ে হারিয়ে যায়। লক্ষন সীতাকে কুটিরে একা ফেলে দাদার প্রাণ বাঁচাতে যাওয়ার আগে কুটিরের চারিদিকে এক গণ্ডি কেটে দিয়ে যায় যাতে কোনো অশুভ দৃষ্টি সীতাকে ক্ষতি করতে নাপারে।

গোলাবাড়ি ঃ যেখানে ফসল সংগ্রহ করে রাখা হয়।

রাজারবাড়ি ঃ এটা কোনো রাজার বাড়ি নয়। রবীন্দ্রনাথের এক সঙ্গীর কল্পিত এক ঘর যা ঠাকুর বাড়ির ভেতরই ছিল কিন্তু তা কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মাখোৎসন ঃ এক প্রকার লোক উৎসব।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ 'আহারে আমাদের.....গন্ধও ছিল না।' শূণ্যস্থান পূর্ণ করো।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার প্রথম পংক্তিটি লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ নারিকেলশ্রেণির ফাঁক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন পল্লীর পুকুর দেখতেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ বাড়ির ভিতরে যে বাগান ছিল তাতে যে সব গাছ ছিল তার যেকোনে দুটির নাম লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বাড়ির উত্তর অংশের একখণ্ড ভূমিকে কবিরা কী বলতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ রাজার বাড়ির আবিস্কর্তা কে?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ 'সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও না...' — বক্তা কে?

.....

১১.৬ ভৃত্যরাজক তন্ত্র — মূল পাঠ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারম্বার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকলতাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনাৰ অবসর পাই নাই— পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই — বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায় — শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখির দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক

হইতেই দেখে। সেইজন্য গুলি খাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাখি চীৎকার করিয়া দল ভাগায়, শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত ইহতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে উপরে আকারপ্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটো এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায় — সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু, যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরুহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া-বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে— তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসম্ভব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চার হাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ এক সময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লাইত; যেন পুষ্করিণীটিকে কোনোমতে, অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া, ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহায় শরীরের কাপড় চোপড়গুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্যা দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেই গুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনো দিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিতে। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে,

সে বরানগরকে বরাহনগর বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, 'অমুক লোক বসে আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন'। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে— এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে; এক দিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে *রামায়ণ-মাহাভারত* শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমারা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল; কৃত্তিবাসেয় সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল — অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটা ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদার সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্মপিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আসন বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অসুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমারা দুধ খাইতে স্বাভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে দুই একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচি-কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেশনকর্তায় কুণ্ঠিত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবায় কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমারা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো-বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

১১.৬.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ঠাকুরবাড়ির পরিবারের ন্যায় অভিভাবকদের কাজ ও ছিল প্রচুর, ফলে সন্তানদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ত ভৃত্যদের উপর। লেখক বলেছেন সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড় অসহ্য। পরমাত্মীয়ের কাছে দুর্বহ। ভৃত্যদের রাখা হত লেখকদের দেখাশোনায় জান্য তারা যে শুধুই তাদের উপর অন্যায় অতাচার চালাত তা নয়। তারা তাদের কর্তব্য পালন করত। বাড়ির অভিভাবকরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভৃত্যদের উপর পড়ত। ফলে নিজের সন্তানদের মতো স্নেহমমতা বর্ষণ ততটা থাকত না। পরম-আত্মীয় হলেও সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি হন না। বালকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের কাজ করতে দিলে সব ঠিক, তা না হলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বালকদের মন জুগাতে ভৃত্যদের অনিচ্ছা সত্বেও ঘোড়া সাজতে হত। মুজুরির লোভে তারা তাদের কাঁধে করে বেড়াত বটে কিন্তু সুযোগ বুঝে তার প্রতিশোধ নিত। ছোট ছেলেদেয় যদি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী খেলতে দেওয়া হয় তবে কোনো অসুবিধে নেই। যদি কেউ বাধা দেয়, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রায়ই দেখা যেত দুরন্ত বালকদের নিয়ে ভৃত্যরা যখন অসহ্য হয়ে যেত তখন তারা তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করত। দাসরাজত্বের ন্যায় তারা ভৃত্যরাজত্ব শুরু করেছিল। লেখকরা যে সমস্ত দুরন্তপনা করতেন সেটা তাদের কাছ খুব স্বাভাবিক মনে হলেও ভৃত্যদের কাছে ছিল দুষ্টতা। ব্যাধ যখন পাখিকে মারতে উদ্যত হয় তখন যেমন পাখিরা সতর্ক হয়ে চীৎকার কার তার দল ভাগানোকে যেমন দুষ্টতা মনে করে। কিন্তু পাখির দিক থেকে সে নিজের সঙ্গীদের জন্য শিষ্টতারই পরিচয় দিয়েছে তা ব্যাধ বুঝতে পায় না। এই ভৃত্যদের মধ্যে লেখকের একজন ভৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার নাম ছিল ইশ্বর। তিনি পূর্বে গুরুমশায়গিরি করত, সবকিছুতে অত্যন্ত শুচিবাইগ্রস্ত ছিল, পৃথিবীতে তার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটি আর জলের অভাব ছিল। তাই সর্বদা তাদের সঙ্গে লড়াই চলত। পুকুরের জলে তিন চার হাত নীচেকার

জল তিনি সংগ্রহ করতেন। স্নানের সময় দুই হাত দিয়ে অনেকক্ষণ পুকুরের উপরের জল কাটিয়ে হঠাৎ একসময় ডুব দিতেন। চলার সময় তান হাতটি বাঁকিয়ে রাখাতেন যদি তার বস্ত্রে ভুলে কখনো লোগে যায়। কিন্তু তিনি মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। তিনি বাচ্চাছেলেদের শান্ত রাখার একটা উপায় বের করেছিলেন। সন্ধার দিকে তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে লেখকদের বসিয়ে *রামায়ণ, মহাভারত* শোনাতেন। এর মাধ্যমে তারা পৌরাণিক বিষয়গুলো এবং কিশোরী চাটুজ্যের অনুপ্রাসের ঝক্ মকিতে ভাষার প্রয়োগকেও তিনি লক্ষ্য করতেন। কোনোদিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠলে তিনি বিজ্ঞতার সঙ্গে মীমাংসা করে দিতেন। কিন্তু তার একটা দুর্বলতা ছিল তিনি আফিম খেতেন তাই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই দেখা যেত ছেলেরা দুধ খাওয়া নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে দ্বিতীয়বার আর কিছু বলতেন না, তা তখন নিজেই পান করতেন। একইরকম ভাবে অত্যন্ত শুচিতা বাঁচিয়ে ছেলেদের পরিবেশন করতেন যাতে কিছু নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। লেখক বলেছেন শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, লেখকদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।



আসুন জেনে নিই...

দাস রাজত্ব ঃ প্রাচীন কালে দাস রাজারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেন।

শুচি সংযত ঃ সবকিছুতে যারা শুচিতা বজায় রাখে।

চলতি ও সাধু ভাষা ঃ মুখের ও লিখিত ভাষা।

কুশ-লব ঃ *রামায়ণের* দুটি চরিত্র। তারা রাম-সীতার জমজ সন্তান।

ভীষ্ম পিতামহ ঃ *মহাভারতে* পাণ্ডব-কৌরবদের পিতামহ। কুরুসভায় সকলের নিম্নে থেকেও তিনি গুরু দায়িত্ব ভার রক্ষা করেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১২ ঃ সংসার ধর্মই এই- বড়ো যে সে মারে, ছোট যেসে- .....। (শূণ্যস্থান পূর্ণ করো)

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ 'ঈশ্বর' নামক ভৃত্যটির পূর্ববৃত্তি কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ ঈশ্বর বরানগরকে কী বলত?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ ঈশ্বয় লেখকদের সন্ধাবেলায় সংযত রাখার জন্য কী উপায় বেড় করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ঈশ্বরের দুর্বলতা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ "দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।"— এখানে কার সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলা হয়েছে?

.....

১১.৭ নানা বিদ্যায় আয়োজন — মূলপাঠ

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্ ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লেংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাষ্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যায় সময় ইংরেজি পড়াইবায় জন্য অঘোর-বাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পয় ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই, জল টগ্‌বগ্ করে — ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প-আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুখ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা

শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরাবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্‌ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্‌ভাবন, এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা টে পাখির বাচ্চাদের পরম সৌভাগ্য, এ কথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে-ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে, সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজিভাষা নয়, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধার পূলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তরু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সন্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোহস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোরবারু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু

তিনি যত ভালো- মানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয়ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন; তহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, গদ্য কি পদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন, মকন্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে- ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ-পনেরো রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাস্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণহাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব।" এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাষ্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, এই কণ্ঠনলীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার কণ্ঠনলীয় ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধর মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল, সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপার পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজিপাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স কোর্‌স্‌ অফ বীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপূরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে থাকে-থাকে সার-বাঁধা সিলেব্‌ল্‌-ফাঁক-করা বানান-গুলো অ্যাক্‌সেণ্ট্‌-চিহ্নের তীক্ষ্ণ। সঙিন উচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজিভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া

আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাষ্টারমহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদেৰ প্রত্যহ ধিক্কার দিতেন। এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতি-সঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালা বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া কবিয়া দুবোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দার দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন ত'বে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মূহুর্তকাল বিলম্ব হইত না।

১১.৭.১ পাঠ বিশ্লেষণ

'নানা বিদ্যার আয়োজন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথর নানান ধরণের বিদ্যা শিক্ষায় সঙ্গে পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। নর্মাল' স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বড়িতে এসে রবীন্দ্রনাথদের পড়াতেন। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে নানা আনুসঙ্গিক শিক্ষাও তাদের শিখতে হতো। ভোরবেলা উঠে তাদের কুস্তি করতে হতো, তারপর মাটিমাখা গায়ের উপর জামা পরে পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক শিখতে হতো, রবিবার সকালে গান শিখতে হতো, এছাড়া মাঝে মাঝে সতীনাথ দত্ত মহাশয় এসে যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। লেখকের কাছে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষাটি বিশেষভাবে ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দেওয়ার সময় তাপ সংযোগে পাত্রর নীচের জল পাতলা হয়ে উপয়ে ওঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামাত থাকে যারজন্য জল টগবগ করে। দুধের মাধ্য জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলে দুধ গাঢ় হয়। রবীন্দ্রনাথ এরই মাঝে অস্থিবিদ্যাও শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অস্থিবিদ্যা শিখাত গিয়ে লেখক বাস্তবিক জ্ঞান আরোহন করেছিলেন কারণ তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনে এনে লেখকদের স্কুলে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। চোখের সামান মানুষের হাড়গুলো দেখা তাদের কাছে বিরাট সুখের ছিল। এরপর বোপদেবের সূত্র ও মুখস্ত করতে হতো। এত কিছু শেখার পর বাংলা শিক্ষার পর ইংরেজি শিক্ষাও অর্জন করতে হয়েছিল। ইংরেজি মাষ্টার ছিলেন অঘোরবাবু। তিনি সন্ধ্যার পর পড়াতে আসতেন। একেতে নিরস ভাষা তাও আবার সন্ধ্যার পর যখন শরীর ক্লান্ত হয়ে আসত, তাই দেখা যেত রবীন্দ্রনাথদের একেবারেই পড়ায় মনোযোগ থাকত না।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের স্বাস্থ্যও অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল, ফলে ঝড়-বৃষ্টি যাই থাকুক না কেন, তিনি এসে হাজির হতেন। তবে তিনি তাদের সহজভাবে

বোঝানোয় চেষ্টা করতেন। কণ্ঠনালীর থেকে আওয়াজ কী ভাবে, বেড় হয়-এর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর কাছেই। ঘরেই তাদের কঠিন থেকে কঠিন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। এখনকার ছেলেদের বইয়ের মতো সে সময় তাদের বইয়ে ছবি আঁকা থাকত না, ফলে বইয়ের পড়ার প্রতি তাদের আকর্ষণটাও কম থাকত।



আসুন জেনে নিই...

সেজদাদা ঃ রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাকৃতবিজ্ঞান ঃ উদ্ভিদ নিয়ে যে বিজ্ঞান।

অস্থিবিদ্যা ঃ মানুষের হাড় নিয়ে যে বিদ্যা শিক্ষা

ভবভূতি ঃ *রামায়ণের* কাহিনি দিয়ে তিনি *উত্তরচরিত* গ্রন্থটি লিখেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল কোন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ 'মানুষজন্মধারী ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো' বলতে লেখক কাকে বুঝিয়েছেন?

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ লেখকদের কে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন?

.....

প্রশ্ন নং ২১ ঃ "কিন্তু তিনি যত ভালো। মানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।" — কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?

.....

প্রশ্ন নং ২২ ঃ "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতায় একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাবো।"— এই কথা বলে মাষ্টার মহাশয় লেখকদের কী দেখিয়েছিলেন?

.....



১১.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

- আপনারা রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থ যেকে নির্বাচিত তিনটি প্রবন্ধ এখানে পড়েছেন। এই প্রবন্ধগুলো থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কয়েকটি কথা জেনেছেন।

- ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যপরিহৃত হয়ে থাকতেন। তাদের শাসনে বাইরে যাবার উপায় ও তাঁর ছিল না। জানালা দিয়েই বাইরের জগতকে দেখতেন।
- অবশ্য তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে বসেই যাতে নানা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে সেসব বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন।



১১.৯ অগ্রগতি অতিরিক্ত পঠন

১) চক্রবর্তী, অজিত কুমার; *কাব্যপরিক্রমা*।
২) দাস, শিশির কুমার; *আত্মজীবনী ঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ।*
৩) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *রবীন্দ্র পরিক্রমা*।



১১.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৮৬১ সন।
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৯১৩ সন।
৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৯১২ সন।
৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ Song Offerings.
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সৌখিনতার।
৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাচাটিতে।
৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সিঙ্গির বাগান।
৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুলগাছ, বিলাতি আমড়া।
৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গোলাবাড়ি।
১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কবির খেলার সঙ্গিনী।
১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পণ্ডিতমহাশয়।
১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঃ মারখায়।
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গুরুমশায় গিরি।
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বরাহনগর।
১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *রামায়ণ* ও *মহাভারত* শোনাতেন।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আফিম এর নেশা।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঈশ্বর।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নর্মাল।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয়কে।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সতীনাথ দত্ত।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইংরেজি শিক্ষক অঘোরবাবু।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মানুষের কণ্ঠনলীর ছবি।

১১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ "অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা"— রবীন্দ্রনাথ 'ঘর ও বহির' প্রবন্ধে একথা কেন বলেছেন?

প্রশ্ন ২ ঃ লেখকদের দেখাশোনার দায়িত্ব কাদের ওপর ছিল? তারা কী ভাবে বালকদের খেয়াল রাখাতেন?

প্রশ্ন ৩ ঃ লেখকরা চটি জুতায় ব্যবহার কী ভাবে করতেন?

প্রশ্ন ৪ ঃ লেখক তার ঘরের ভেতর থেকে 'বহির' দিকটিকে কীভাবে উপভোগ করতেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ "উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুড়ে হইয়া পাড়" — তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৬ ঃ ভৃত্যরাজক তন্ত্রকে লেখক কোন রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং কেন?

প্রশ্ন ৭ ঃ রবীন্দ্রনাথ 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' প্রবন্ধে দুষ্টতা ও শিষ্টতার পরিচয় কী ভাবে বুঝিয়েছেন?

প্রশ্ন ৮ ঃ "সম্পূর্ণভার জিনিসটা বড় অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষে ও দুর্বহ"— তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৯ ঃ ইশ্বর কে? তার শুচি সংযত আচার নিষ্ঠায় পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১০ ঃ রবিবারে রবীন্দ্রনাথদের যে শিক্ষা অর্জন করতে হতো, একটি উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

প্রশ্ন ৫ ঃ অস্থিবিদ্যা শিখতে গিয়ে লেখক কী নিয়ে বাস্তবিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ ইংরেজি শেখার মাষ্টার কে ছিলেন? তার শিক্ষকতার পরিচয় দাও।

*** ***** ***

অধ্যায় ১২ ঃ *জীবনস্মৃতি* — ২

অধ্যায় বিন্যাস

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১২.২ পরিচিতি

১২.৩ ভানুসিংহের কবিতা — মূলপাঠ

১২.৩.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১২.৪ স্বাদেশিকতা — মূল পাঠ

১২.৪.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১২.৫ মৃত্যুশোক — মূল পাঠ

১২.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

১২.৭ অতিরিক্ত পঠন

১২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সৃষ্টির পরিচয়
- প্রাচীন কবিতা উদ্ধারের বাসনা
- ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় গীতিকাব্যের তুলনা নিয়ে আলোচনা করা যায়
- রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের জাগরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে
- স্বদেশীভাবনায় হিন্দু মেলার উপযোগিতা নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়
- ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভাবনা রক্ষার ক্ষেত্রে জ্যোতিদাদার নতুন পদক্ষেপ
- স্বদেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিবারের উদ্যোগ দিয়াশালাইয়ের কারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদি তৈরির প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা
- রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধির পরিচয়
- মৃত্যুলোকের মাধ্যমে লেখকের দার্শনিক মনোভাবের বিকাশ
- রবীন্দ্রনাথেৰ মধ্যে শোকের থেকে বৈরাগ্য ভাবের উদয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১২.১ পরিচিতি

বর্তমান অধ্যায়ে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'ভানু সিংহের কবিতা', 'স্বদেশিকতা' এবং 'মৃত্যুশোক' সম্পর্কে অধ্যয়ণ করবেন। এই তিনটি রচনা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি, স্বদেশ প্রেম এবং মৃত্যুশোক মাধ্যমে জীবনকে কী ভাবে নতুন করে দেখেছেন তার পরিচয় দিয়েছেন।

১২.৩ ভানুসিংহের কবিতা — মূলপাঠ

পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে- রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমরা ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনবার চেষ্টার যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না; বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালক কবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কা-মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির

পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।

১২.৩.১ পাঠ বিশ্লেষণ

কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সৃষ্টির পরিচয় আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্য করি। ঠাকুরবাড়িতে কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলত এবং রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন কবিদের লেখার মধ্যে মৈথিলী মিশ্রিত ভাষার সংযোজন থাকত বলে তা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হতো। রবীন্দ্রনাথকে এই দুর্বোধ্যতা ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল, এরপর তিনি নিজে এইরূপ রহস্যের আবরণে আবৃত হয়ে কবিতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুদিন পূর্বে অক্ষয়বাবু এই প্রাচীন কবিতা সংকলণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি চ্যাটার্টন নামক এক বালক কবির কথা বলেছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিদের এমন ভাবে নকল করতেন কেউ তা বুঝতে পারতেন না। অবশেষে মাত্র ষোলবছর বয়সে হতভাগ্য এই কবি আত্মহত্যা করে মারা যান। রবীন্দ্রনাথ এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রাচীন কবিদের অনুসরণে এক আলো-আধারি কবিতা তাঁর এক বন্ধুকে শোনালেন। বন্ধু হয়তো ঠিকমতে বিচার না করেই খুব ভালো হয়েছে বলে জানিয়ে দেন, বলেন- "বেশ তো,

এতো বেশ হইয়াছে।" এরপর ছাপানোর জন্য জোর দেন। বলেন সেইধরণের পুথি তিনি চান। তার লেখা এমন কবিতা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির হাত দিয়েও হয়ত বেড় হতে পারত না। তিনি কাব্যগুলো ছাপানোর জন্য অক্ষয়কুমারকে দিতে চাইলেন এমনকি সে সময় ড° নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে ভারতীয় গীতিকাব্যের সম্পর্ক নিয়ে একটি বই লিখে ডাক্টার উপাধিও পেয়েছিলেন। এবং ভানুসিংহকে প্রচুর সন্মান দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর কবিতাগুলোতে দিশি নহবতের প্রাণ গলানো সুর ছিল না, তাতে ছিল বিদেশি আর্গিনের সাধারণ সুর। প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মত সেখানে সাবলীলতা ছিল না সেখানে ছিল আধুনিক কালের নতুনভাবে তৈরী করা কিছু রীতি। কিন্তু তিনি এরই মাঝে প্রাচীন কবিদের লেখাকে যথেষ্ট সন্মানের সঙ্গে দেখিয়েছেন।



আসুন, জেনে নিই...

ভানুসিংহের কবিতা ঃ প্রাচীন কবিদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনামে লেখা কবিতা।

ভাৰতী ঃ ১২৮৪ তে প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকাটি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখা *ভারতী*তে প্রকাশ পেত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঃ প্রাচীন কাব্য সংকলন কর্তা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঃ প্রাচীন বিখ্যাত পদকর্তা তাদের লেখার মধ্যে মৈথিলী মিশ্রীত ভাষার সংযোজন থাকত যা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতো।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ লেখক কার কাব্যসংগ্রহ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ মেঘাচ্ছন্ন এক দুপুরে রবীন্দ্রনাথ স্লেটে যে কবিতার অংশটি লিখেছিলেন তা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ইংরেজদের বালক কবির নাম কী ছিল যিনি প্রাচীন কবিদের অনুসরণে সুন্দর কবিতা লিখতেন?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দুজন বিখ্যাত পদকর্তার নাম লেখা?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ভানুসিংহের কবিতাগুলো কোন প্রত্রিকায় প্রকাশিত হত?

.....

১২.৪ স্বাদেশিকতা — মূল পাঠ

বাহিরে হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবর যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নতুন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে — তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। *টাইম্‌স্* পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসন-কর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই

সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোরর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুন্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয় বিরল।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত অনাহুত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশু-পক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব

করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেণ্ডন্ট্ এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলনে, "ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠেকে বহু দুরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজ যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র

বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকুরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্যঙ্গ— তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না — না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহু না শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিন তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিতে, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন— গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২.৪.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ইংরেজ শাসিত ভারতীয় সমাজে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে

পরিচয় হলেও স্বদেশি ভাবনাকে তার পিতা এবং দাদা কেউই কখনো ভুলে যায়নি। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত "হিন্দুমেলা" তাদের স্বাদেশিকতাবোধের পরিচয় বহন করে। এই মেলায় রবীন্দ্রনাথের মেজ দাদা সেই সময়ের বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করেছিলেন। এই মেলায় স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত হত ও দেশী গুণী লোককে পুরস্কৃত হত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই স্বদেশিভাবনা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। স্বদেশি ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মেলায় স্বদেশি কবিতা পাঠ ইত্যাদি হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যগে 'স্বদেশিকতার সভা' নামক যে গুপ্ত সভায় দেশপ্রেমের চর্চা শুরু হয়েছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত বর্ণনার খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিল। বৃটিশদের তাড়াতে না পারলেও এই সভা তরুণদের স্বদেশিভাবনায় ভীষণভাবে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকী এই সভাকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশের সার্বজনীণ দেশীয় আদর্শে চিহ্নিত পোশাকের যে ছাপ রেখেছেন, তাও দেশপ্রেমের আদর্শকে বহন করে। ভারতবর্ষের সার্বজনীন পরিচ্ছদকে প্রকাশ করতে জ্যোতিদাদা কর্মক্ষেত্রে ধুতি উপযোগী নয় এবং পায়জামা বিজাতীয়, তাই এমন একটা আপোস করে পোষাক পড়লেন যেখানে পায়জামার উপর একপ্রস্ত কাপড় পাট করে স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়ে দিলেন। সোনার টুপির সঙ্গে পাগড়ি মিলিয়ে দিলেন। দেশলাই তৈরীর উদ্যোগ, নিজেদের কাপড়ের কলে স্বদেশি কাপড় উৎপাদনের প্রচেষ্টা এসব কিছুতে তখন সমাজের স্বদেশিকতা বোধের যে উজ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সর্বকালের দেশ প্রেমের আদর্শ।

রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল সহ শিকারে বের হতেন। বরাহুত অনাহুত অনেকে এসে তাদের যোগ দিতেন। এই শিকারে রক্তপাত হতোনা কিন্তু অন্য অনুষ্ঠান বেশ ভালোভাবেই হতো। পশু পাখির অভাব ও অনুভব করতেন না। ভোরে বেড় হতেন বলে বৌঠাকুরাণী তাদের জন্য লুচি তরকারি প্রস্তুত করে দিতেন।

শেষে রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে। তিনি বলেন রাজনারায়ণ বসু স্বাদেশি সভায় খুব সক্রিয় চরিত্র হিচাবে ছিলেন। তাঁর বয়স বেড়ে গেলেও ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলতেন। তার বাইরের দিকের প্রবীণতা তার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন জাগিয়ে রেখেছে। এমনকি পাণ্ডিত্যও তাকে কোনো ক্ষতি করেনি। না বয়সের গম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুখ কষ্ট, কিছুতেই তার হাসির আবেগ ঠকানো যেত না। তিনি নিজের জীবন দেশের উন্নতির কাজে হাসি মুখে লাগিয়ে ঈশ্বরকে তার জীবন সম্পর্ণ করে দিয়েছিল এবং সুর লাগুক না লাগুক তিনি আপন মনে গান গেয়ে চলতেন।



আসুন, জেনে নিই...

হিন্দুমেলা ঃ ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের অধীনে জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তুলতে এক মেলার আয়োজন করা

হয়েছিল, যেখানে দেশীয় কবিতা, গান, খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হতো।

লর্ড কার্জন ও লর্ড লিটন ঃ এরা ব্রিটিশ শাসক ছিলেন।

ঋক্‌মন্ত্র ঃ *ঋক্‌বেদের* মন্ত্র, 'ঋক' শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য। সত্যকে জানা বা সত্যজ্ঞানই হচ্ছে এর মূলকথা।

মেজদাদা ঃ রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফোর্ট উইলিয়াম ঃ বৃটিশ সরকার দ্বারা কলকাতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দুর্গ ও কলেজ, মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করা ও ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালকোঁচা ঃ মল্লের মতো পরিহিত কাপড়ের কোঁচাকে টেনে পেছনে লাঁজা।

রিচার্ডসন ঃ উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের খ্রীষ্টান অধ্যাপক।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'হিন্দুমেলার অন্যতম কর্মকর্তা কে ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিকর সভার সভাপতি কে ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকের সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ লেখকদের স্বাদেশিক সভা কোথায় বসত?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ সঞ্জীবনী সভার সাংকেতিক নাম কী ছিল?

.....

১২.৫ মৃত্যুশোক — মূল পাঠ

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রতক্ষ্য করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাঁহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী

আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে" তখনই বউঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর-একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সন্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধু ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইল যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনাই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু, আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলিইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডনঙ্গ যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি— যাহা গেলা তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'- আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নতুন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভাবি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে- দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধূতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত, এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ- সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছসাধন, তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা; সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইল কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিত ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টরলনি মনুমেন্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল; পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছনার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

১২.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ঠাকুরবাড়িতে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে অনেকটা শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের মা অনেকদিন ভুগছিলেন। তিনি লেখকদের সঙ্গে এক ঘরে শয়ণ করতেন, তাঁর রোগের সময় কিছুদিনের জন্য তাকে গোটা করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তিনি অন্তঃপুরের তেতালয় থাকতেন, যে রাত্রিতে তিনি মারা যান, লেখকরা কেউ সামনে ছিলেন না। দাসী এসে খবর দেওয়া? তারা জানতে পারে। ছেলোবলায় মায়ের মৃত্যু হওয়ায় প্রথমত তিনি মৃত্যুকে বুঝে উঠতে পারেননি। মা চলে যাওয়ার পর বৌঠানরা মায়ের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মাকে আর কোনোদিন ঘরকন্নার কাজে দেখতে পাবে না- এই ভেবে মায়ের শব যাত্রার সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেলফুলের কুঁড়িগুলো চাদরের প্রান্তে বেঁধে মায়ের স্নেহের ছোঁয়া অনুভব করতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে আরো গভীরভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখলেন। মৃত্যু যে কতটা শোকের, কতটা বিষাদময় এবং এরই মাঝে পৃথিবীর সজীবতা, সময়ের গতি চলমান জীবন বয়ে চলছে। মৃত্যু বা শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ যখন চারদিক আবিষ্ট করে থাকে তখন তার একমাত্র পরিত্রাণ আলোর দিকে। অন্ধকারময় শোকাচ্ছন্ন জীবন চিরদিন থাকতে পারে না। মৃত্যুর পরই রয়েছে নতুন সৃষ্টি, নতুন জীবন — এধরনের আশাবাদী মনোভাব লেখকের মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। আপনজনদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তার মধ্যে একসময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মেছিল, কিন্তু বিরাট মুক্তির স্বাদকে আস্বাদন করতে শেখায় তিনি মৃত্যুকে নতুনরূপে বুঝতে পারলেন। এক-একবার মৃত্যুর শোকে ভেঙে পড়লেও পরমুহূর্তে তিনি নতুন আশার আলোয় উঠে দাঁড়িয়েছেন।



আসুন, জেনে নিই...

রবীন্দ্রনাথের মা ঃ সারদাদেবী। রবীন্দ্রনাথের খুব কম বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈরাগ্য ঃ যে ধর্ম সংসার ধর্মকে ত্যাগ করে। ভোগবিলাসহীন জীবনকে গ্রহণ করতে শেখায়।

থ্যাকার ঃ উইলিয়াম মেকপিস্ থ্যাকারের বিখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠান।

অক্টরলনি মনুমেন্ট ঃ ১৮২৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত স্যার অক্টরলণির স্মরণে যে শহীদ মিনার মেটাই অক্টরলনি মনুমেন্ট নামে নিহ্নিত। সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিদানকারী ভারতীয়দের স্মরাণ এই স্মৃতি সৌধটি উৎসর্গ করা হয়।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১১ ঃ রবীন্দ্রনাথের মায়ের অসুখের সময় তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" — কে এই করুণ মন্তব্যটি এসে রবীন্দ্রনাথদের জানায়?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ মাতৃহীনা বালকদের কে দেখাশোনা করতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ রবীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যুর পর কিসের মধ্যে তিনি মায়ের ছোঁয়া অনুভব করতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ "আমার..... বয়সের সময় মৃত্যুরে সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।" (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

.....



১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন যে, ভালো আত্মজীবনীর বিশেষত্বই এই যে, তা জীবনকে বাইরের কয়েকটা ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে বন্দীর মতো করে দেয়া না, তা জীবনের অন্তরতম স্থানের একটি গভীর অভিপ্রায়ের সূত্রে বাইরের ঘটনাগুলোকে এমনিভাবে গেঁথে ফেলে, যাতে জীবনের সব বৈচিত্র্যই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়।
- বর্তমান অধ্যায়র তিনিটা অংশ পড়ে রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে সমৃদ্ধ এই কথাগুলোই মনে পড়াবে আপনাদের।



১২.৭ অতিরিক্ত পঠন

১) চক্রবর্তী, অজিত কুমার; *কাব্যপরিক্রমা।*

২) দাস, শিশির কুমার; *আত্মজীবনী ঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ।*

৩) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *রবীন্দ্র পরিক্রমা।*

১২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংকলিত কাব্যসংগ্রহ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'গহন কুসুম-কুঞ্জ-মাঝে'।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চ্যাটার্টনের।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *ভারতী* পত্রিকায়।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবগোপাল মিত্র।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ রাজনারায়ণ বসু।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ উত্তর কলকাতায় ঠনঠনিয়া অঞ্চলর একটি পোড়ো বাড়িতে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'হামচুপামুহাফ'।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গঙ্গায়।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ একজন পুরাতন দাসী।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠা বধূ।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বেলফুলের কুড়িগুলের মধ্যে।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চব্বিশ বছর।



১২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ রবীন্দ্রনাথ কেন এই কাব্যসংগ্রহ গুলির প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন?

প্রশ্ন ২ ঃ অক্ষয়বাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথ কোন ইংরেজ বালক কবির কথা শুনেছিলেন, তার সাধারণ বিবরণ দাও।

প্রশ্ন ৩ ঃ প্রাচীন কাব্যকে অনুসরণ করে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই পঙ্‌ক্তিটি তিনি কাকে শুনিয়েছিলেন, তাতে তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

প্রশ্ন ৪ ঃ ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের গীতিকাব্যকে তুলনা করে ভানুসিংহকে কে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেই কেন ভানুসিংহের কবিতার সমালোচনা করেছেন?

প্রশ্ন ৬ ঃ হিন্দুমেলা কী? এই মেলার সম্বন্ধে লেখক আমাদের কী কী জানিয়েছেন?

প্রশ্ন ৭ ঃ ভারতের 'সার্বজনীন পরিচ্ছদ' হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ধরণের পোষাক তৈরী করেছিলেন?

প্রশ্ন ৮ ঃ স্বাদেশিক সভার দলবলের শিকার পর্বের বর্ণনা দাও।

প্রশ্ন ৯ ঃ স্বাদেশিকতায় রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ১০ ঃ মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের মায়ের শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল?

প্রশ্ন ১১ ঃ রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ তাঁর মনে কী রকম প্রভাব ফেলেছিল?

প্রশ্ন ১২ ঃ লেখক কখন কী ভাবে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন?

প্রশ্ন ১৩ ঃ দুঃখের মাঝে আনন্দকে কী ভাবে খুঁজতে শিখলেন রবীন্দ্রনাথ?

*** ***** ***

অধ্যায় ১৩ ঃ *বিচিত্র প্রবন্ধ* — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যায়-বিন্যাস

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩.২ পরিচিতি

১৩.৩ গ্রন্থকার পরিচিতি

১৩.৩.১ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

১৩.৪ মূল প্রবন্ধ ঃ ছোটোনাগপুর

১৩.৪.১ ছোটোনাগপুর ঃ সামগ্রিক আলোচনা

১৩.৫ মূল প্রবন্ধ — মা ভৈঃ

১৩.৫.১ মা ভৈঃ — সামগ্রিক আলোচনা

১৩.৬ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১৩.৭ অতিরিক্ত পঠন

১৩.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা-বিষয়ে জানতে পারবেন
- সামগ্রিক প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় ও তার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- 'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আরও নানা কথা জানতে পারবেন
- 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকেও নানা কথা জানতে পারবেন।

১৩.২ পরিচিতি

বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতে মোট কুড়িটি প্রবন্ধ রয়েছে। আমাদের পাঠ্য দুটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলি হল, 'ছোটোনাগপুর' এবং 'মা ভৈঃ'।

বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। উপরিউক্ত প্রবন্ধ থেকে দুটি প্রবন্ধকে এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩.৩ গ্রন্থকার পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিধারা বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ — সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

১৮৬১ সালের ৭ মে তারিখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। তাঁর পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ পিতা-মাতার চতুর্দশ সন্তান ছিলেন।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, সে সময়টা ছিল আলোকদীপ্তিতে উজ্জ্বল। বঙ্গদেশে সে সময় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ পেরিয়ে দেখা দিয়েছে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালটা মধুসূদনের যুগ আর বাল্য-কৈশোর-যৌবন কিংবা মননের প্রস্তুতি পর্ব বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ঘটেছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য ও আভিজাত্য।

বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রায় সকলেই ছিলেন কৃতী এবং বিশিষ্ট। দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি, সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকার ও অনুবাদক। দিদি স্বর্ণকুমারী ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সাহিত্যে-শিল্পে-সংগীতে-ধর্মান্দোলনে-রাজনৈতিক কর্মে এবং সামগ্রিক চিন্তাজগতে আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় পরিবার। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারেরই উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব।

কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁর জীবনচর্যা ছিল অতি সাধারণ। তাঁর পড়াশুনোর আরম্ভ হয় গৃহশিক্ষকের কাছে। শৈশবে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল অকাদেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্সে কিছুদিন শিক্ষা লাভ করলেও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। পরবর্তীকালে বিলেতে লেখাপড়া করতে গেলেও তাঁর কোনো বিদ্যায়তনিক ডিগ্রি নেওয়া হয়ে ওঠেনি। তিনি বাড়িতেই দর্শন-ধর্ম-সাহিত্য-সংগীতের চর্চা করতেন। উল্লেখ্য যে পিতার সঙ্গ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বেশ ক'বার দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে প্রথমবার বোলপুরে এসেছিলেন ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে এই বোলপুরেই তিনি 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথকে কৈশোরে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবী—দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। এই 'নতুন বৌঠান' প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' ছাপা হয়ে বেরোয়। এরপর থেকে তাঁর রচনা সাহিত্যের নানা শাখায় পল্লবিত হতে থাকে। রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা যেমন বিপুল, তেমনই বিচিত্র। উল্লেখ্য

যে এ পর্যন্ত রবীন্দ্র রচনাবলী তিরিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

বনফুল (১৮৭২) কাব্যসংকলনটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। *কবি কাহিনী* (১৮৭৮), *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২), *প্রভাতসঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬), *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (১৮৮৪) প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। *মানসী* কাব্য প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯০ সালে। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজন ভাবনা বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *কল্পনা* (১৯০০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই সময়কাল রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিলাইদহ পর্ব নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গদর্শন-গীতাঞ্জলি-বলাকা এই তিন পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলনগুলি হল— *নৈবেদ্য* (১৯০০), *খেয়া* (১৯০৭), *গীতাঞ্জলি* (১৯১০), *গীতালি* (১৯২৪), *গীতিমাল্য* (১৯১৪), *বলাকা* (১৯১৬), *পলাতকা* (১৯১৮), *পূরবী* (১৯২৫), *মহুয়া* (১৯২৯)। রবীন্দ্র জীবনের শেষ দশকে রচিত হয়েছিল *পুনশ্চ* (১৯৩২), *প্রান্তিক* (১৯৩৮), *জন্মদিনের* (১৯৪১) মতো কাব্যসংকলন। পঁয়ত্রিশটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্রমববির্তনের সুর। এই গতিশীলতা ছাড়াও রবীন্দ্র কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি যা রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপ।

কাব্যচর্চার পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল— *চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *শেষের কবিতা* (১৯২৯)। তিনি মোট বারোটি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য তাঁর সৃজন কর্মের মাধ্যমে ঋদ্ধ হয়েছে— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি সংকলিত হয়েছে *গল্পগুচ্ছ* নামক গ্রন্থে। বাংলা ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই উদ্ভাসিত হয়েছে। বিচিত্র ভাব ও বিষয়ের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পোস্টমাস্টার, অতিথি, দুরাশা, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য ও নাটকের বৈচিত্র্য অপরিসীম। তাঁর প্রথম চল্লিশ বছরের নাটকের আধার পদ্য, পরবর্তী জীবনের আধার গদ্য। তাঁর শেষ জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত, গীত-নৃত্যের সমন্বয়ে রচিত। *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৩), *তাসের দেশ* (১৯৩৩) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পঞ্চমাঙ্ক, কৌতুকনাট্য ও রূপক-সংকেতধর্মী নাটক। এই শ্রেণির নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— *বিসর্জন* (১৮৯০), *রাজা ও রাণী* (১৮৮৯), *শারদোৎসব* (১৯০৮), *রাজা* (১৯১০), *ডাকঘর* (১৯১২), *মুক্তধারা* (১৯২৫), *রক্তকরবী* (১৯২৬)।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্যতম শাখা হল গান বা সংগীত। অখণ্ড *গীতবিতানে* যেসব গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, অনেকের মতে তাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাষাশিল্পী ও সুরশিল্পী — এই দুই সত্তার সমাবেশ ঘটেছে। উল্লেখ্য যে 'জনগণমন

অধিনায়ক' এবং 'আমার সোনার বাংলা' এই সংগীত দুটি ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও মনীষার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। ভারতীয় দর্শন, উপনিষদের বাণী বারবার নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সাধক ও জীবন শিল্পীর মূর্তমান প্রতীক। আশি বৎসর বয়সে ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তারিখে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত সালে হয়েছিল?

(ক) ১৮০১ (খ) ১৮৪১ (গ) ১৮৬১

(ঘ) ১৮৬৫।

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন—

(ক) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (খ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ রবীন্দ্রনাথের মাতা ছিলেন সারদা দেবী। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ *শেষের কবিতা* (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের নাম। (সত্য/মিথ্যা)

.....

১৩.৩.১ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারী ও কলকাতার ফোর্ট উলিয়াম কলেজের হাত ধরেই প্রকৃত অর্থে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যাত্রা শুরু। প্রথম পর্বের বাংলা গদ্যে উইলিয়াম কেরি, জে মার্শম্যান, রামরাম বসু প্রমুখের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের বিকাশের পাশাপাশি ক্রমশ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও সূচনা হতে দেখা যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ। ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে রচিত তাঁদের প্রবন্ধগুলি অসামান্য পাণ্ডিত্য ও

মনীষার পরিচয় বহন করছে। এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের রচনারাজি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছে— এ কথা বলা বাহুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞান রহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধরাজি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য নানা বিষয়ের অভিমুখ খুলে দিয়েছে এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে বৈচিত্র্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

মননশীল চিন্তাচর্চা ও গভীর সৌন্দর্যবোধ— এ দুয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। *সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভাণ্ডার* ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* — এই পাঁচটি সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এছাড়া সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধরাজি। মুখ্যত *ভারতী, সাধনা বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)* এবং *সবুজপত্র* এই তিন ক্রমপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের নানারূপ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাহিত্য-সমালোচকরূপে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে। *ভারতী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই মুখ্যত তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রভৃতি প্রথম দিকে রচিত প্রবন্ধগুলিতে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে আদিপর্বের এই রচনাগুলিতে রবীন্দ্রচিন্তা বা মননের আভাস স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে।

সাধনা-বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে যে শৈলী বা ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন, তা তাঁর ভাষার ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তররূপে পরিচিত। এই দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনারীতি হয়ে উঠেছে লালিত্যময়, ঔজ্জ্বল্য ও সরসতায় সমৃদ্ধ। ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প ও অলঙ্কারের প্রাধান্যে এ সময়কার সাহিত্যকৃতি অধিকতর সজীব হয়ে উঠেছে। এই পর্যায়র উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের ভাব ও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্য অননুকরণীয়। মুখ্যত নিজের মননের গড়ে ওঠা ও সাহিত্যিক হয়ে ওঠার কিছু টুকরো ছবি রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ স্মৃতিকথার মাধ্যমে এখানে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের তৃতীয় বা শেষ ভাষাস্তর হল 'সবুজপত্র' পর্ব। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার পরিবর্তে এবারে কথ্যরীতির ওপর জোর দিয়েছেন ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উচ্চমানের শিল্পী। নানা বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ রচনা করে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন— "কবিতায় গানে সুরে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের নূতন উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবন্ধে তিনি হয় আনন্দের নূতন উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছেন অথবা আমাদের চিন্তার আগ্রহ বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া অতীত হইতে ভবিষ্যতে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন।"



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৬ ঃ *কমলাকান্তের দপ্তর* গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(ক) রামমোহন রায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ *ভারতী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ *জীবনস্মৃতি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ *পঞ্চভূত* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....



আপনাদের করণীয় — ১৩.১

ক) রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য-বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন

১৩.৪ মূল প্রবন্ধ ঃ 'ছোটোনাগপুর'

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায়-ঘুমে স্বপ্নে-জাগরণে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর

শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা; আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানালায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল; যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না— আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতো কালো ঝাঁকড়া-চুলের-ঝুঁটি-বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারি দিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকা চুলের মতো। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে এক-একটা অশথগাছ, আমগাছও দেখা যায়। শুষ্ক ক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটীরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে তাকাইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। একে কি আর গাড়ি বলে। চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা।

সর্বপ্রথমে গিরিডি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যত দূরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ। চারি দিকে যেন রাঙা মাটির ঢেউ। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারি দিকে চাহিয়া কী যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আর-একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্‌ পট্‌ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেসৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্‌ গড়্‌ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু

রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া; এই পাহাড়গুলোকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল 'বরাকর নদী'। টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া, আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে চার-পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চালিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারি দিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই, চারি দিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধূধূ করিতেছে। দিক্-দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্- এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে।

দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ। তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারি দিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূর বিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিঘুঁজি, আবর্জনা, নর্দমা, ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে শহরটি তক্‌তক্ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুরবেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুইটা শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরে-সুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয়, এখানকার মানব জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্‌ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাঁধিয়াছে, তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারি দিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে, শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, 'আর কেহ জাগুক না-জাগুক, আমি জাগিয়া আছি।' কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

১৩.৪.১ ছোটোনাগপুর ঃ সামগ্রিক আলোচনা

'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটি *বালক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৪ বছর। এ সময়পর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধে 'ছবি ও গান' (১৮৮৩-৮৪) অন্যতম। এর অল্পকাল পরেই তিনি লিখছেন *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৫-৯৬) কাব্যগ্রন্থটি। ইতিমধ্যে বউঠান কাদম্বরী দেবীর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) প্রয়াণ ঘটেছে (১৮৮৪)।

প্রবন্ধটি *বালক*-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'দশ দিনের ছুটি' শিরোনামে। এই ছুটিতে তিনি ছোটোনাগপুর বেড়াতে এসেছিলেন। এখানে আসার প্রসঙ্গ ও এখানকার পরিবেশের এক মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রবন্ধটির নাম পালটে 'ছোটোনাগপুর' রাখা হয়।

'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটির তিনটি অংশ। একটি রেলপথে যাত্রা, দ্বিতীয়টি গাড়িতে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে হাজারিবাগের বর্ণনা। এ তিনটি অংশ জুড়ে রচিত হয়েছে

'ছোটোনাগপুর'। এটি মূলত ভ্রমণবিষয়ক রচনা। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ এধরনের কিছু রচনা লিখেছিলেন। এমনকি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'য়ুরোপ প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের পত্র' (১৮৭৮-৭৯) শিরোনামে। পূর্ব ভারতের পাহাড় ঘেরা ছোটোনাগপুর অঞ্চল বাঙালিদের কাছে স্বাস্থ্যকর স্থানরূপে পরিচিত। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ অঞ্চলে এসেছিলেন এবং তারই প্রেক্ষিতে এ রচনার উদ্ভব।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে রেল চলাচল শুরু হয়। সেসময় রেলযাত্রা ছিল এক দুর্লভ ব্যাপার। তাই প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ রেলযাত্রা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক তাঁর অনুভূতি ও মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। ছোটোনাগপুর যাওয়ার জন্য 'হাবড়া' থেকে রেলগাড়িতে চড়া কিংবা রাত চারটায় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি পরিবর্তন করা— এসব জরুরি তথ্যের পাশাপাশি রেলগাড়িতে চড়ার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যেন গাড়ির ঝাঁকুনিতে নাড়া খেয়ে ঘুম দুলিয়ে যায়। আবার, গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ মাথার ভেতর সারারাত ধরে নাচতে থাকে। এর পাশাপাশি দিনের আলোকে রেলযাত্রার অভিজ্ঞতাও বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়। প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ রেলগাড়ি থেকে প্রকৃতির রং-রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে,

দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল; যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না— আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সংগে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। কবির চোখে তিনি প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কাব্যিক সৌন্দর্যময় পদ্য ভাষায় তিনি তাঁর মনো ভাব প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন বাংলা প্রবন্ধে এ ভাষা ছিল অনন্য।

গিরিধি স্টেশন থেকে গাড়ি পালটাতে হবে। আর রেলপথ নেই। এবারে যেতে হবে ডাকগাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলছেন যে এটিকে গাড়ি বলা যায় না। তিনি রেলভ্রমণের যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম বর্ণনা দিয়েছেন, তার পাশে ডাকগাড়ির ভ্রমণ নিয়ে তেমন কোনো মন্তব্যই করেননি। তাঁর মনে হয়েছে, মানুষ টেনে নিয়ে যাওয়া এই গাড়ি যেন 'চারটে চাকার উপর একটি ছোটো খাঁচা'।

রবীন্দ্রনাথ ছোটোনাগপুর যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন নানাভাবে। কখনো রেলযাত্রার বর্ণনা আবার কখনো বা গাড়িতে চড়ার বর্ণনা। এখানে প্রকৃতিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্যিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্ত,

(ক) পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ

রৌদ্রে শুইয়া আছে।

(খ) স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া; এই পাহাড়গুলোকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ, যেন ভীষ্মের শরশয্যা।

লোকালয়হীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, পাহাড়, নদী, বন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সজীব হয়ে উঠেছে। যুবক রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতিকে দেখেছেন মুক্ত আঙিনায়। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যেভাবে উপলব্ধি করেছে, তার তুলনায় এ অনুভূতি অনেক বেশি প্রগাঢ় ও আন্তরিক। প্রকৃতি এখানে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

অবশেষে এ যাত্রা হাজারিবাগ এসে থামল। হাজারিবাগের 'শাহরিক ভাব' খুব বেশি নেই। প্রকৃতি যেন ঘিরে রয়েছে এই শহরটিকে। তাই স্বভাতই এখানে কোনো কোলাহল নেই, ব্যস্ততা নেই, মুখে ভাবনার চিহ্নও নেই। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যেন, 'এখানকার মানব জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্‌ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে।'



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১০ ঃ 'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

(ক) বালক (খ) ভারতী (গ) বঙ্গদর্শন।

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ গ্রন্থভুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রবন্ধটির নাম কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছোটোনাগপুর ভ্রমণে এসেছিলেন? (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....



আসুন, জেনে নেই...

ছোটোনাগপুর ঃ ছোটোনাগপুর প্রাচীনকাল থেকেই ঘন অরণ্যে বেষ্টিত। অনার্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই অঞ্চল দীর্ঘদিন স্বাধীন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছোটোনাগপুর মারাঠা রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

পরবর্তীতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের পর ব্রিটিশের করদ রাজ্যরূপে ছোটোনাগপুর স্বীকৃতি পায়। এই অঞ্চলটি প্রথমাবস্থায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি ২০০১ সালে গঠিত হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। মুখ্যত ছোটোনাগপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নবগঠিত এই রাজ্যটি।

হাজারিবাগ ঃ বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি শহর। ছোটোনাগপুর ডিভিসনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এই শহরটি অবস্থিত। হাজারিবাগের দূরত্ব রাঁচি থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার। এখানে ভ্রমণের আদর্শ সময় হল, অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। ভ্রমণপিপাসু ও প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছে হাজারিবাগ আদর্শ স্থান। শান্তিপ্রিয় এই অঞ্চলে প্রকৃতির শোভা ও দৃশ্য উপভোগ করতেই পর্যটনকেরা এখানে ভিড় জমান।

ডাক গাড়ি ঃ ডাক বা চিঠিপত্র বয়ে নিয়ে যায় যে গাড়ি। এই এক কামারার গাড়িটা আগে ঘোড়ায় বা মানুষে টানত।

ডাক বাংলা ঃ যে পথ ধরে ডাকগাড়ি যায় সেই পথে কিছু দূর ব্যবধানে সরকারি কর্মচারীদের বিশ্রামের জন্য তৈরি বিশ্রামশালা।



আপনাদের করণীয় — ১৩.২

'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটি বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৩.৫ মূল প্রবন্ধ — মা ভৈঃ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিতে তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহার পাসমার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না; তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার

পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা কৃশতা ঘৃণ্যতা, গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে— এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর-এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব এ কথা বলা যেমন শক্ত, সুখটা চাই না এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই তবে এ দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই', নয় বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই না'। 'চাই' বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই— 'চাই না' বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই— এমন ধিক্কার বহন করিয়াও তাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড়ো হোক, কাহারো কাছে সে খাতির দাবি করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর লাগে। না মরিলে সেটা সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালো মন্দ কোনো-একটার অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন। তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা নিজদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।
ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধৃজাতিকে ডাকিয়া বলেন, 'তোমরা লড়াই করিয়াছ, প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস করিতে যাইবে।'

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই। সেইজন্য যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসংগত, অর্থহীন কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য। অথচ যখন ভাবিয়া দেখি আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয় মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোক-নির্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে; বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় নাই। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলে তাহার অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব করিতে হয় তবে আমার সাহস আছে এই মিথ্যা গর্বই সব চেয়ে মার্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহংকারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এই সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই সেখানে এই লজ্জার চর্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণ বিসর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়। অতএব আমাদের পিতামহীয়া কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিয়ার শক্তি তাঁহাদের ছিল— লজ্জায় হউক, প্রেমে হউক, ধর্মোৎসাহে হউক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত, দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন্য দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ; চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি-দ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয় অমর স্মরণ-নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহু-রূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরবস্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।

১৩.৫.১ মা ভৈঃ — সামগ্রিক আলোচনা

বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। আর এটি প্রকাশিত হয়েছিল *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন* পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য এসেছেন। এর কিছু কাল পূর্বে *নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের* প্রকাশ শুরু হয়। এ সময়পর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

'মা ভৈঃ'-এর আভিধানিক অর্থ হল— 'ভয় কোরো না', 'অভয়বাণীবিশেষ'। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'উদয় দিগন্তে মাভৈঃ মাভৈঃ নবজীবনের আশ্বাসে'।

প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে একটি কালো কঠিন কষ্টিপাথরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমেই সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হয়ে থাকে— রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলেছেন।

এমন একটি বিশ্বব্যাপী চিরকালীন ভয় পৃথিবীর ওপর যদি না-থাকত, তবে সত্যি-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধরূপে পাওয়ার কোনো উপায় থাকত না।

মৃত্যুকে যাঁরা জয় করতে পেরেছেন, তাঁদের জগত ও জীবনে কুণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তাঁদের জীবন পরীক্ষিত হয়েছে মৃত্যুর দ্বারা। প্রাণশক্তিতে যে সিক্ত, তাঁর মৃত্যুতে ভয় নেই— আর যাদের প্রাণ নেই, তারাই মৃত্যুকে ভয় করে; মরতে তাদের কৃপণতা।

সুখের অধিকার একমাত্র তাঁরই, যিনি নির্ভয়ে মরতে জানেন। যিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'— তিনিই প্রকৃত সুখী। জীবনের সুখ-বিলাসকে আঁকড়ে ধরে নয়, যাঁরা সুখের পেছন পেছন দৌড়োয় না, ফিরে তাকায় না পেছনে— তারাই প্রকৃত সুখকে উপলব্ধি করতে পারেন। সহজ করে বলা যায়, যাঁরা প্রকৃত ত্যাগ করতে জানেন, তাঁরাই সঠিক ভোগ করার অধিকারী। এই ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে পৌরুষ।

সুখ কিংবা প্রাণ— দুই-ই জরুরি। যা চাই, তা যেন আমরা দাবি বা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। সহজেই যেন বলতে পারি যে এটা আমার চাই কিংবা চাই না— " হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই', নয় বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই না'।"

প্রবন্ধটির শেষার্ধে বাঙালির রাষ্ট্রশক্তির ঐতিহ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন। কেননা বাঙালিরা এ-সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাদের কোনো পূর্ব-ঐতিহ্য নেই। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন— "তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম।"

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন— "যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময় নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসংগত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।"

মৃত্যুকে জয় করতে পারলেই জীবনকে প্রকৃতার্থে উপলব্ধি করা যাবে। মৃত্যু নামক ভয়কে জয় করলেই জীবন অকপট হয়ে ওঠে। তাই 'মা ভৈঃ'রূপে অভয়বাণী শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি বা বাংলার প্রকৃত ইতিহাস নেই— দীর্ঘদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ-আক্ষেপ করেছিলেন। ইংরেজরা একটি পাখি শিকার করলেও তার ইতিহাস রচিত হয়। অথচ বাংলার কোনো ইতিহাস নেই। বঙ্কিম-পরবর্তীসময়ে রবীন্দ্রনাথও এ-কথার পোষকতা করেছেন। তবে এ কথাও সত্যি, প্রাণ দেবার দৃষ্টান্ত বাঙালির যে একেবারেই নেই, তা নয়। 'আমাদের ইতিহাস নীরব' এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বললেও বাঙালির প্রাণ দেবার শক্তি যে রয়েছে, তা তিনি দেখিয়েছেন। 'মাতামহীদের' সহমরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মৃত পতির সঙ্গে চিতাকাঠে বাঙালি বীরাঙ্গনাদের প্রাণ বিসর্জনের প্রসঙ্গ এনে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সাহসের কথা তুলেছেন। তাই তিনি বলেছেন যে বাঙালির ইতিহাস নীরব হলেও চিতার অগ্নিশিখা ঘরে ঘরে এই বাণীই বহন করছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, এই অগ্নিশিখা সকলকে আশীর্বাদ করবে এবং এর ভেতর দিয়েই উপলব্ধি হবে— "মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক।"

'মা ভৈঃ' রচনাটি মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধরীতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি-মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার স্ফুরণ ঘটেছে এ-প্রবন্ধে। মৃত্যুকে ভয় নয়, জয় করেই প্রাণশক্তির উন্মেষ ঘটতে পারে— রবীন্দ্রনাথ এ প্রত্যয়ের কথাই এখানে তুলে ধরেছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

(ক) বালক (খ) ভারতী (গ) নবপর্যায় বঙ্গদর্শন।

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ 'মা ভৈঃ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল— 'ভয় কোরো না', 'অভয়বাণীবিশেষ'। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....



আসুন, জেনে নেই...

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ঃ ১৯০১ সালে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। প্রথমাবস্থায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার। উল্লেখ্য যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার মান, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও রুচির দিক থেকে 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী পত্রিকারূপে পরিচিত। চার বছর প্রকাশের পর ১৮৭৬-এর মার্চ মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হলেও তা বন্ধ (১৮৮৩) হয়ে যায়। দুবার বন্ধ হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' (১৩০৮-১৩১২) প্রকাশিত হতে থাকে।



১৩.৬ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে তিনটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর ফলে আপনারা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম, বাংলা প্রবন্ধ সহিত্যের ধারণা করতে পেরেছেন। এছাড়া আপনারা যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও। জানতে পেরেছেন শান্তিনিকেতনের বিষয়েও।
- 'ছোটনাগপুর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবিষয়ক রচনার স্বরূপ জেনেছেন।
- 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে ভয় ও আতঙ্ক থেকে মানুষকে উত্তীর্ণ হবার মন্ত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া এখানে তাঁর গদ্যশৈলীর পরিচয়ও আছে।



১৩.৭ অতিরিক্ত পঠন

১) দাস, শ্রীশচন্দ্র ; *সাহিত্য-সন্দর্শন।*

২) দে, অধীব; *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ২য় খণ্ড।*

৩) পাল, প্রশান্তকুমার; *রবিজীবনী, ১-৯ খণ্ড।*

৪) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার; *রবীন্দ্র-জীবনী, ১-৪ খণ্ড।*

৫) সেন, সুকুমার ; *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।*

৬) সিংহ, মীনাক্ষী ; *রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা।*

৭) Abrams, M. H. *A Glossary of Literary Terms.*



১৩.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৮৬১।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *সোনার তরী* এবং *গীতাঞ্জলি*। (অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।)

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শুদ্ধ।

৯ নং প্রশ্নৰ উত্তর ঃ অশুদ্ধ।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *বালক*।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দশদিনের ছুটি

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শুদ্ধ।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শুদ্ধ

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শুদ্ধ

১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন ২ ঃ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন ৩ ঃ 'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধটির তিনটি অংশ। এই অংশ তিনটির পরিচয় তুলে ধরুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন ৪ ঃ 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটির সামগ্রিক আলোচনা করুন।(৪০০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন ৫ ঃ 'ছোটোনাগপুর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রেলপথে যাত্রার পরিচয় তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

প্রশ্ন ৬ ঃ 'যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই।' উক্তিটির আলোচনা করুন।(২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

*** ***** ***

অধ্যায় ১৪ ঃ বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যায়-বিন্যাস

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪.২ পরিচিতি

১৪.৩ শব্দ, পদ, বাক্য

১৪.৩.১ পদ পরিবর্তন

১৪.৪ বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

১৪.৫ বাংলা বানান

১৪.৫.১ বানান রীতি

১৪.৫.২ অশুদ্ধ বানান ও তার সংশোধিত রূপ

১৪.৬ শব্দভাণ্ডার

১৪.৬.১ শ্রেণিবিভাগ

১৪.৬.২ মৌলিক শব্দ

১৪.৬.৩ আগন্তুক শব্দ

১৪.৭ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

১৪.৭.১ সমার্থক শব্দ

১৪.৭.২ বিপরীতার্থক শব্দ

১৪.৮ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

১৪.১০ অগ্রগতি-নির্ধারিক উত্তর

১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্তমান অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন—

- পদপরিবর্তন কীভাবে হয়
- শব্দভাণ্ডারের শ্রেণিভেদ
- মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের পরিচয়
- বাগ্বিধি বা বাগ্‌ধারা প্রয়োগে কীভাবে ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে তোলা যায়
- সমার্থক ও বিপরীত শব্দের স্বরূপ (তালিকাসহ)
- বাংলা বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম
- বানানের অশুদ্ধি সংশোধন।

১৪.২ পরিচিতি



প্রথাগত ব্যাকরণ ঃ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকে অনুসরণ করে সন্ধি, সমাস, বচন, পুরুষ, কারক ইত্যাদি যেগুলোকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও প্রয়োগ করেছেন তাকেই প্রথাগত ব্যাকরণ বলতে পারি।

বিষয় হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের ব্যাপ্তি বহু বিস্তৃত। তার মধ্যে পদ, সন্ধি, ণ-ত্ব বিধি, ষ-ত্ব বিধি, প্রত্যয়, সমাস, কারক-বিভক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনারা মাধ্যমিক স্তরেই পড়ে এসেছেন. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে যিনি ভবিষ্যতে পড়বেন তাঁকে এগুলো অবশ্যই আবার জানতে হবে। এদের আমরা ***প্রথাগত ব্যাকরণ*** বলতে পারি। তবে বর্তমানে আপনারা এগুলো পড়বেন না। বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়ে অনেক সময় আপনাদের সামনে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যে বাক্যটা লিখলেন তাকে কি আর একটু শ্রুতিমধুর করে লেখা যায়? বা মনের ভাবটা প্রকাশ করতে গিয়ে বাক্যকে একেবারে সাধারণ ভাবে না লিখে তাকে কি হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় না? কারণ যা বলার বা লেখার তাকে সবসময় সুন্দর করে বলতে হয়। একেই বলে ভাষাচর্চা। বর্তমান অধ্যায়ে এধরনের চর্চাসুলভ ব্যাকরণই আপনারা পড়বেন।

এই অধ্যায়ের পড়াগুলো অবশ্যই প্রথাগত ব্যাকরণের অন্তর্গত, তবু ভাষা সুচারুভাবে প্রকাশের জন্য এগুলো জানা প্রয়োজন। আপনাদের লক্ষ্য হবে, যা লিখতে চাইছেন তা যেন পাঠকের মনকে আনন্দ দেয়। সেটা প্রশ্নের উত্তরই হোক আর অন্য কিছু লেখাই হোক।

তবে পাঠকের চিত্তাকর্ষক করে লেখার অন্যতম শর্ত হলো বানান-শুদ্ধি। আমাদের ভালো লেখার অন্তরায় বানান ঠিকঠাক না লেখা। এই অধ্যায়ে আপনারা অধুনা প্রচলিত বানান রীতির কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পড়বেন এবং তাকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। বাংলা বানান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আজকের নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বানানের সংস্কার নিয়ে চিন্তাচর্চা শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বানান সংস্কারের জন্য যে বানান রীতি তৈরি করা হয়েছিল, তাকে মেনে নিয়েই পরবর্তী সময়ে বাংলা বানান লেখা হয়েছে। তবে এখন সেই বানান রীতি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বানানের যথোপযুক্ত সংশোধনও করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে আপনারা বিভিন্ন শব্দের যে বানান দেখবেন তা ওই সংশোধিত রীতিকে মেনেই লেখা হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আধুনিক বানানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আপনারা এখন থেকে সবসময় 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' ব্যবহার করবেন।



আসুন জেনে নিই ...

বাঙালিরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য অর্থ সমন্বিত শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য যখন ভাষায় ব্যবহার করেন তখন তাকে বাংলা ভাষা বলা হয়। যে বইতে এই ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ আছে এবং যা পড়লে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে বা বলতে পারি তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিতে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি লেখক ও ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা। ১৯৩৬ সালের ৩১ মার্চ প্রকাশিত হয় এই বানান সমিতির নিয়মাবলি।

১৪.৩ শব্দ, পদ, বাক্য

আপনারা জেনেছেন অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিকেই ভাষা বলে। শব্দ, পদ— এরা বাক্যেরই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং বাক্যই অর্থগত শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভাষাকে সুন্দর করে তোলে। আলাদা আলাদা ভাবে 'বন্যা', 'পশু', 'মানুষ', 'প্রাণহানি' ইত্যাদি পদের অর্থ রয়েছে। কিন্তু যদি এরকম একটা বাক্য লিখি,— 'অসমের পশু, মানুষ ঘটেছে বন্যায় প্রাণহানি ব্রহ্মপুত্রে'— তাহলে কি একে অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে? নিশ্চয়ই না। সুতরাং অর্থপূর্ণ শব্দের মধ্যে ভাষার প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকলেও ভাষা প্রাণ পায় তখনই যখন তাকে সুশৃঙ্খলভাবে বাক্যে ব্যবহার করা যায়। আবার এই শব্দ, পদ বা বাক্যের যখন বিশিষ্ট প্রয়োগ করা হয় তখন ভাষায় প্রকাশ পায় দীপ্তি, যা তাকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এক কিংবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় শব্দ। শব্দ স্বতন্ত্রভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, আদালত, হাসপাতাল, বাঘ ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ। তবে বিভক্তি চিহ্ন ছাড়াও পদ হতে পারে। যেমন, 'তিনি মহাভারত পড়ছেন'। এখানে 'মহাভারত' বিভক্তি চিহ্নহীন পদ।

১৪.৩.১ পদ পরিবর্তন

আপনারা জানেন বাংলা ব্যাকরণে পাঁচ রকমের পদ আছে— বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। এই পাঁচটির মধ্যে একমাত্র বিশেষ্য ও বিশেষণেরই পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং পদপরিবর্তনের অর্থ হল বিশেষ্য পদকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করা।

আসুন জেনে নিই ...



কৃৎ ও তদ্ধিত ***প্রত্যয়*** যোগ করে বিশেষ্য ও বিশেষণপদকে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্যে পরিবর্তিত করা যায়। -তব্য, -অনীয়, -ত, -ঈ, -এ, -অ, -অন, -তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে এই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

বিশেষ্য পদকে বিশেষণে পরিবর্তন করলে তার রূপ কেমন হয় তা এই উদাহরণগুলো থেকে দেখুন —



প্রত্যয় ঃ একটি পদের প্রথম অংশকে বলে প্রকৃতি আর দ্বিতীয় অংশ প্রত্যয়। প্রকৃতি অংশের সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যোগ করে শব্দ গঠন করা যায় তাকেই প্রত্যয় বলে। বাঁধ্, চল্, নাচ্ ইত্যাদি ধাতু প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণ যোগ করলে হয় কৃৎ প্রত্যয়। আর শব্দ প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণ যোগ করে হয় তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন- চল্ + অন্ত = চলন্ত (কৃৎ), ডাক্তার + ই = ডাক্তারি (তদ্ধিত)

বিশেষ্য	**বিশেষণ**
অণু	আণবিক
অগ্র	অগ্রিম
অনুবাদ	অনূদিত
অগ্নি	আগ্নেয়
অন্তর	আন্তরিক
আদর	আদুরে
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
উন্মাদ	উন্মত্ত
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত
অংশ	আংশিক
কর্ম	কর্মী
কায়	কায়িক
উত্তাপ	উত্তপ্ত
উপকার	উপকৃত
খণ্ড	খণ্ডিত
খেদ	খিন্ন
গো	গব্য
গ্রহণ	গ্রহণীয়, ***গ্রাহ্য***
গ্রাম	গ্রামীণ, গ্রাম্য
ঘর	ঘরোয়া
চোর	চোরাই
চক্ষু	চাক্ষুষ
জন্তু	জান্তব
জন্ম	জাত
তেজ	তেজী
দহন	দাহ্য
দেব	দৈব
দেহ	দৈহিক
দোষ	দুষ্ট
ধর্ম	ধার্মিক
নগর	নাগরিক
ধার	ধারালো



গ্রহণ ঃ আমার আবেদন গ্রহণ করুন।

গ্রাহ্যঃ আমার কথা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না।

- আপনি আমার মতামতকে ***গ্রাহ্য*** নাও করতে পারেন, কিন্তু প্রণাম ***গ্রহণ*** করতে অসুবিধা কোথায়? এভাবে পদের পরিবর্তন করে বাক্যে প্রয়োগ করা যায়।

নিশা	নৈশ
বিধি	বৈধ
পুর	পৌর
পাথর	পাথুরে
পিশাচ	পৈশাচিক
ভাত	***ভেতো***
ভূমি	ভৌম
নাশ	নষ্ট
মন	মানসিক
মুখ	মৌখিক
মধু	মধুর
মাটি	মেটে
যোগ	যৌগিক
শরীর	শারীরিক
সূর্য	সৌর



'***ভাত*** এত বেশি বেশি খেলে সবাই তোমাকে ***ভেতো*** বলে অপমান করবে।' (পদ পরিবর্তনের ফল ও বাক্যে তার প্রয়োগ লক্ষ করুন)

বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করলে তার রূপ কেমন হয় তা এই উদাহরণগুলো থেকে দেখুন —

বিশেষণ	**বিশেষ্য**
অলস	আলস্য
কঠিন	কাঠিন্য
চতুর	চাতুর্য
চঞ্চল	চাঞ্চল্য
চালাক	***চালাকি***
তরুণ	তারুণ্য
দরিদ্র	দরিদ্রতা, দারিদ্র্য,
দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
নিষিদ্ধ	নিষেধ
প্রচুর	প্রাচুর্য
প্রবল	প্রাবল্য
মধুর	মাধুর্য
বিচিত্র	বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা
বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য



চালাক ঃ চালাক লোকেরা সবসময় ***চালাকি*** দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়।



শীত ঃ শীতকালে পাহাড়ি অঞ্চলে ***শৈত্য*** প্রবাহ বইতে দেখা যায়।

হিংস্রতা ঃ খাঁচায় ***হিংস্র*** পশুরাজ কখনও ***হিংস্রতা*** ভোলে না।

মুগ্ধ	মোহ
শীত	***শৈত্য***
সার্থক	সার্থকতা
সুরভি	সৌরভ
উচিত	ঔচিত্য
উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য
হিংস্র	***হিংস্রতা***
উদার	ঔদার্য
সামুদ্রিক	সমুদ্র
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ কোন্ কোন্ পদের পরিবর্তন করা যায়?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ পদ পরিবর্তনে কী কী প্রত্যয় যোগ করতে হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ শুদ্ধ না অশুদ্ধ লিখুন—

ক) 'অনূদিত' একটি বিশেষ্য পদ।

খ) 'অংশ' একটি বিশেষণ পদ।

গ) 'চোর' পদটির বিশেষণ 'চুরি'।

ঘ) 'দরিদ্র' পদ পরিবর্তনে 'দারিদ্র্য' হয়।

.....

১৪.৪ বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

পরিচিত শব্দসমষ্টি বা বাক্যাংশকে বিশিষ্ট অর্থে প্রকাশ বা ব্যবহার করাকেই বাগ্‌ধারা বা বাগ্বিধি বলে। প্রত্যেকটি ভাষারই এ এক অমূল্য সম্পদ। বাগ্‌ধারা ব্যবহারে কথা বলার ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আসে এবং তা ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বাইরে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও অত্যন্ত সজীব করে তোলে। আপনাদের পড়ার জন্য এখানে বাংলা বাগ্‌ধারার বিশাল ভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংযোজিত হল।

অকাল কুষ্মাণ্ড (= অকর্মণ্য, অপদার্থ) — পাঁচুটা একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড, এক ক্লাসেই চারবার ফেল করল।

অরণ্যে রোদন (= ব্যর্থ আবেদন) — ওই হাড় কিপ্‌টের কাছে চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই নয়।

আকাশ-কুসুম (অলীক কল্পনা) — পড়ার দিকে মন নেই, অথচ ডাক্তার হবার আকাশ-কুসুম ভাবনা !

আষাঢ়ে গল্প (= আজগুবি কথা) — কাজটা পারোনি বলে আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে সাফাই দিও না।

ইঁচড়ে পাকা (= অকালে বখে যাওয়া বা স্বভাব নষ্ট হওয়া) — ওই ইঁচড়ে পাকা ছেলেটাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

ইতি গজ (= কোনোরকমে দায়সারা ভাবে কাজ সারা) — মোহনবাবুর বাড়ি যাবার তাড়া ছিল, তাই ক্লাসটা ইতিগজ করেই সারলেন।

উত্তম-মধ্যম (= প্রচণ্ড মারধোর করা) — চোরটাকে সবাই মিলে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিল।

উভয়-সঙ্কট (= দু-দিকেই বিপদ) — আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট, গেলে মেজোবাবু চটেন, না গেলে বড়োবাবু।

এক চোখা (= পক্ষপাতী) — একচোখা লোককে কেউ পছন্দ করে না।

এক গোয়ালের গোরু (= একই দলের) — অমল বলো আর বিমল বলো সব এক গোয়ালের গোরু।

কলুর বলদ (= নিষ্ফল পরিশ্রম করা, অন্যের স্বার্থে পরিচালিত হওয়া) — চায়ের দোকানে ছেলেটা দিনরাত কলুর বলদের মতো খাটছে অথচ এক পয়সাও পাচ্ছে না।

গোবর গণেশ (= নির্বোধ) — ওই গোবর গণেশটাকে খবর আনতে পাঠিয়েছ, তবেই হয়েছে।

গুড়ে বালি (= আশা পূর্ণ না হওয়া) — আশা ছিল পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবো, কিন্তু মামারা চলে আসায় সে গুড়ে বালি।

ঘাড়ে ভূত চাপা (= দুর্বুদ্ধিকে আশ্রয় করা) — ঘাড়ে কী ভূত চাপল কে জানে, এত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল।

চুনোপুঁটি (নগণ্য লোক) — আসল অপরাধীদের বাদ দিয়ে পুলিস এখন চুনোপুঁটিদের ধরছে।

ছা-পোষা (= সাধারণ গৃহস্থ) — হরিপদবাবু ছা-পোষা কেরানি।

জগা-খিচুড়ি (= এলোমেলো হয়ে থাকা) — অফিসে গিয়ে দেখলাম সব কাগজ-পত্র জগা-খিচুড়ি হয়ে আছে।

টনক নড়া (= হুঁশ হওয়া) — এখন সব হারিয়ে তার টনক নড়েছে।

টাকার শ্রাদ্ধ (= অযথা ব্যয়) — অনুষ্ঠান না টাকার শ্রাদ্ধ, কী দরকার ছিল এত আড়ম্বরের?

ঠুঁটো জগন্নাথ (= নিষ্কর্মা) — ওঁর মতো ঠুঁটো জগন্নাথ এখানে আর কেউ নেই।

ডুমুরের ফুল (= দুর্লভ দর্শন, অদৃশ্য) — কী রে, পরীক্ষার পর যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলিঙ্গ

ঢাক পেটানো (= সগর্বে প্রচার করা) — নিজের ব্যাপারে সবাই ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়।

তীর্থের কাক (= কিছু পাওয়ার আশায় দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা) — ইণ্টারভিউ দিতে এসে সবাই তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

তাল পাতার সেপাই (= রোগা লম্বা লোক) — তোমার মতো তালপাতার সেপাই সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়ে কাজ নেই।

নয়নের মণি (= অত্যন্ত আদরের) — ছেলেটি তার মায়ের নয়নের মণি।

পগার পার (= নাগালের বাইরে চলে যাওয়া) — পুলিশ আসতে আসতে ডাকাতের দলটা পগার পার হয়ে যাবে।

পোয়া বারো (= সবদিক দিয়ে লাভবান) — একে বড়োলোকের ছেলে তায় মোটা মাইনের চাকরি, তোমার তো এখন পোয়াবারো হে।

ব্যাঙের সর্দি (= অসম্ভব ব্যাপার) — ওঁর মতো দাম্ভিক এই গরিবের ঘরে আসবেন, এ যে ব্যাঙের সর্দি হওয়াঙ্গ

ভাগের মা (= যার সম্বন্ধে কেউ নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে না) — ভাগের মা গঙ্গা পায় না, তাই সংসারের উন্নতি আর হয়নি।

মুখের কথা (= সহজ কাজ) — চাকরি পাওয়া আজকাল মুখের কথা নয়।

শাপে বর (= মন্দ থেকে ভালো হওয়া) — আগের কাজটা ছেড়ে দিয়ে তোমার শাপে বরই হয়েছে।

সুখের পায়রা (= সুসময়ের বন্ধু) — রায়বাবুর সুখের পায়রারা আজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

হাতের পাঁচ (= শেষ সম্বল) — তোমার মা হাতের পাঁচ হিসাবে এই টাকা ক'টাই রেখে গেছেন।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাগ্‌ধারা ব্যবহারে কথা বলার ভঙ্গিতে কী পরিবর্তন আসে?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ 'অলীক কল্পনা' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করবেন—

(ক) আষাঢ়ে গল্প, (খ) গুড়ে বালি (গ) আকাশ কুসুম

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'নয়নের মণি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কোনটি লিখুন —

(ক) সাধারণ গৃহস্থ। (খ) নিষ্কর্মা। (গ) অত্যন্ত আদরের।

.....



আসুন জেনে নিই...

বাংলায় যাকে বাগ্বিধি বলছি সেটাকেই ইংরেজিতে 'idiom' বলে। অনেক ইংরেজি 'ইডিয়ম'-এর বঙ্গানুবাদ বাংলায় বাগ্বিধি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'কাচের ঘরে বসে থাকা', 'কেকের ভাগের প্রতিযোগিতা' ইত্যাদি। আজকাল সংবাদপত্রের শিরোনামে বাগ্বিধি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।



আপনাদের করণীয়— ১৪.১

(ক) পাঁচটি বিশেষ্য শব্দকে বিশেষণে পরিবর্তিত করে প্রত্যেকটির একটা করে বাক্য রচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

১৪.৫ বাংলা বানান

মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার আগে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় যাবতীয় গ্রন্থ হাতে-লেখা পুঁথিতে ধরে রাখা ছিল। সেসব পুঁথিতে যে বানান অনুসরণ করা হতো তাতে একদিকে যেমন লেখকদের শিক্ষা ও রুচির প্রতিফলন দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি সে-সময়ের বানান রীতিরও আঁচ পাওয়া যায়। এ-সব বানানের মধ্যে উচ্চারণকে অনুসরণ করে লেখার প্রবণতা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকেই প্রথম বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা শুরু হয়। তবে জটিলতা কাটতে অনেক সময় নিয়েছে। এখনও যে সম্পূর্ণ জটিলতা কেটেছে তা নয়। তবু একটা সাধারণ নিয়ম তৈরি হয়ে গেছে যার সাহায্যে কোন বানান কীভাবে লেখা হবে তা সহজেই জেনে নেওয়া যায়।

আপনারা বর্তমান আলোচনায় সেই সাধারণ নিয়মগুলোকে জানবেন ও বানান লেখার সময় এই নিয়মকে মেনে চলার চেষ্টা করবেন। আপনারা এর আগে জেনেছেন যে ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রথম এই নিয়মাবলি প্রকাশ করা হয়েছিল (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 'পরিচিতি' অংশ দেখুন)।

১৪.৫.১ বানান রীতি

বাংলা বানানকে বর্তমানের সংশোধিত রূপে লিখতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলোকে অনুসরণ করবেন। এখানে অবশ্য সবগুলো নিয়মকে আপনাদের পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হল না, যেগুলো খুব জরুরি সেগুলোকেই এখানে তুলে ধরা হল।

- *রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন* — সংস্কৃত ব্যাকরণে এই নিয়মটি থাকলেও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে সংস্কৃতের নিয়মে লিখিত বানানে রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব প্রচলিত ছিল। যেমন — পূর্ব্ব, কার্য্য, অর্দ্ধ, কর্ত্তা ইত্যাদি। কিন্তু এদের অধুনা গৃহীত বানান হবে পূর্ব, কার্য, অর্ধ, কর্তা। এরকম আরও শব্দ — শর্ত, পর্দা, কর্ম, বর্জন, ধর্ম, ভট্টাচার্য, সূর্য, বর্ধমান।
- *হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন (ই/ঈ, উ/ঊ)* — **তৎসম** শব্দের ক্ষেত্রে যে বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুটি বিকল্পই আছে সেখানে হ্রস্ব বানানই ব্যবহৃত হবে। যেমন— 'কুমীর' নয় 'কুমির', পাখী > পাখি, ঊনিশ > উনিশ, চীৎকার > চিৎকার, পল্লী > পল্লি ইত্যাদি। **তদ্ভব** শব্দে সবসময় হ্রস্ব স্বরই ব্যবহৃত হবে। তেমনই কয়েকটি শব্দের বানান এরকম — দিঘি, বাড়ি, হাতি, হিরা, রানি, কাহিনি, শ্রেণি, সূচি ইত্যাদি।

  স্ত্রীবাচক, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দে হ্রস্ব স্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন — মাসি, পিসি, পাগলি, চাকরানি, কাকি, ইংরেজি, গুজরাতি, অসমিয়া, বাঙালি, ফরাসি, জমিদারি, ডাক্তারি, তবলচি ইত্যাদি। 'আবলি' সংস্কৃতে বিকল্প হিসাবে প্রচলিত ছিল বলে বাংলায় দীপাবলি, প্রশ্নাবলি, নামাবলি ইত্যাদি বানান লেখা উচিত। বিদেশি শব্দ বাংলায় গৃহীত হলে সেখানে 'ই'-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন, খুসি, তৈরি ইত্যাদি।
- *'ঙ' না 'ঙ্গ'*— যে বানানে এই দুটোই প্রচলিত সেখানে শুধু 'ঙ'-এর ব্যবহার হবে। কোথাও বিকল্পে 'ং'-ও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন — বাঙালি, বাংলা, রঙ, ভাঙন
- *'ঙ' আর 'ং', 'ম্'* — সন্ধির দ্বিতীয় অংশের প্রথম অক্ষর যদি ক, খ, গ, ঘ হয় তবে প্রথম অংশের শেষ অক্ষর 'ম' ং-এ রূপান্তরিত হবে। যেমন—

  অলম্ + কার = অলংকার

  অহম্ + কার = অহংকার

  সম্ + গীত = সংগীত

  ভয়ম্ + কর = ভয়ংকর

  এভাবে 'ম্'-এর পরে অন্তঃস্থ 'ব' থাকলে 'ং' হবে। যেমন —

  কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি

  কিম্ + বা = কিংবা

  সম্ = বাদ = সংবাদ



তৎসম ঃ সংস্কৃত থেকে যে শব্দগুলো প্রায় অবিকৃতভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো তৎসম শব্দ। উচ্চারণে আলাদা হলেও লেখায় তা সংস্কৃতের অনুরূপ।

তদ্ভব ঃ যে শব্দগুলোর মূল সংস্কৃত কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়।

বর্গীয় 'ব'ঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলোতে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে— ক, চ, ট, ত, প। প-বর্গে আছে প, ফ, ব, ভ, ম। এই 'ব'-টিই বর্গীয় 'ব'। অন্যত্র 'ল'-এর পরে যে 'ব'-টি আছে তা অন্তঃস্থ 'ব'।

সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা

তবে 'ম্'-এর পরে ***বর্গীয় 'ব'*** থাকলে 'ম্'-ই থাকবে। যেমন — সম্ + বোধন = সম্বোধন। কিন্তু যেখানে সন্ধি হয়নি বা 'ম্' সন্ধির পরিণামে আসেনি সেখানে 'ং' নয় 'ঙ'-ই ব্যবহার করতে হবে। যেমন — অঙ্গ, বঙ্গ, সঙ্গে, কঙ্কাল, বঙ্কিম ইত্যাদি।

- *'কী' আর 'কি'* — যখন প্রশ্ন করলে উত্তরটা 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে দেওয়া যায় সেখানে 'কি' হবে। এছাড়া আর সর্বত্র 'কী' হবে— সেটা কর্মবাচ্য হোক, প্রশ্নমূলক সর্বনাম হোক, বিশেষণ হোক বা আশ্চর্যবোধকই হোক।

  যেমন — কী চাই?
  বাঃ কী চমৎকার !
  কী রাম কী শ্যাম, সব সমান।
  কীভাবে যাবে।
  কী হে, কবে যাচ্ছো?

  তবে এমনকি কিনা (তুমি যাবে কিনা, তাই উশখুশ করছ) ইত্যাদি হ্রস্বই হবে।

- *পদান্তে 'ও'কার*— বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাচক আদেশ বা অনুজ্ঞা বোঝাতে ক্রিয়াদের শেষে 'ও' কার ব্যবহৃত হবে। যেমন— করো, চলো, পড়ো, কোরো, পোড়ো, খেয়ো ইত্যাদি। তার তুচ্ছার্থক (অর্থাৎ তুই সম্বোধনে ব্যবহৃত) অনুজ্ঞা 'ও'-কার হবে না। যেমন— 'তুই কর'। অতীত ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদে (অনুজ্ঞা ছাড়া) 'ও' কার ব্যবহৃত হবে না। যেমন— বলত, হল, বলব, কয়ব, হত ইত্যাদি। ইংরেজি 'Too' অর্থে 'ও' যোগ করলে সেটা পদান্তে থাকবে। যেমন— আজিও, আরও। লো-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ 'ও'-কার দিয়েই লেখা হবে। যেমন— জোরালো, ধারালো, প্যাঁচালো ইত্যাদি। এ-ছাড়া পদান্তে 'ও' কার যুক্ত করা বা না করার আরও কয়েকটি নিয়ম আছে। আপনারা 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' বইটির শেষে প্রদত্ত 'বানানবিধি' দেখতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে এটুকু জেনে রাখুন যে, কয়েকটি পদের অর্থভেদকে স্পষ্ট ভাবে বাক্যে প্রকাশ করতে পদান্তে 'ও'-কার দিতে হবে। যেমন, কালো (কাল = সময়), বারো (বার = সপ্তাহের একটি দিন), মতো (মত = সদৃশ), ভালো (ভাল = কপাল), চালানো(চালান = রপ্তানী), খাটো(খাট = কাঠের তৈরি বিছানা, তক্তাপোশ)। সংখ্যাবাচক শব্দও 'ও'-কার দিয়ে লিখতে হবে— এগারো, পনেরো, ষোলো।

- *'ন' এবং 'ণ'*— ণত্ব-বিধান শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, অন্যত্র নয়। যেমন— অঘ্রান (অগ্রহায়ণ), কান, চিরুনি, রানি, সোনা, ধরন, করুন ইত্যাদি।



আসুন জেনে নিই...

ঋ, র্ (র ফলা), ষ্-এর পর যদি কোনো শব্দে 'ন' থাকে তবে সেটা 'ণ' হবে। এটাকে ণত্ব-বিধি বলে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ থেকে এই নিয়ম সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল বলে তদ্ভব শব্দ মাণিক, সোণা, রাণী, কাণ ইত্যাদিতেও 'ণ' প্রয়োগ করা হত। এভাবে 'ঋ'-এর পর যে কোনো শিসধ্বনি 'ষ'-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঋষি, বৃষ। আবার 'ট' ও 'ঠ'-এর আগে যুক্তবর্ণরূপে ব্যবহৃত শিসধ্বনিও 'ষ' হয়। যেমন নিষ্ঠুর, কষ্ট, ভ্রষ্ট, ইত্যাদি। তৎসম শব্দের এই বানান রীতিকে ষত্ব-বিধি বলে।

- *ক্ষ এবং খ* — তৎসম শব্দ ছাড়া অন্যত্র 'ক্ষ'-এর স্থানে 'খ' লিখতে হবে। যেমন— 'ক্ষুধা', কিন্তু 'খিদে' (তদ্ভব); 'ক্ষেত্র', কিন্তু 'খেত' (তদ্ভব)। এরকম আরও কয়েকটি প্রয়োগ — খুদ, খেউরি, খেপি, খ্যাপা; খুর ইত্যাদি।
- *বিসর্গ (ঃ) ও হসন্ত চিহ্ন* — তৎসম শব্দে শব্দান্তের বিসর্গ ও হসন্ত চিহ্ন থাকবে না। যেমন — অন্তত (অন্ততঃ নয়), প্রথমত (প্রথমতঃ নয়), ক্রমশ (ক্রমশঃ নয়), প্রায়শ (প্রায়শঃ নয়), আশিস (আশিস্ নয়), পৃথক (পৃথক্ নয়)। ব্যাকরণ-সম্মত বিকল্প রূপ থাকায় দুঃস্থ, নিঃস্তব্ধ, নিঃস্পৃহ, মনঃস্থ ইত্যাদি বানান লিখতে হবে দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, মনস্থ রূপে। তবে অন্যান্য শব্দে ভিতরকার বিসর্গ ও হসন্ত চিহ্ন থাকবে। যেমন— বয়ঃসন্ধি, অতঃপর, প্রাতঃকৃত্য, বাগ্‌দেবী, বাগ্‌ধারা, দিক্‌চক্র ইত্যাদি।
- *ঋ-কার ও খণ্ড-ত (ৎ)* — অতৎসম শব্দে (তদ্ভব) ঋ-কার এবং খণ্ড 'ত' (ৎ) ব্যবহৃত হবে না। যেমন — বৃটিশ > ব্রিটিশ, খৃস্টান > খ্রিস্টান, কিসমৎ > কিসমত, শরবৎ > শরবত, কাৎলা > কাতলা ইত্যাদি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কোন সময় বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়মে বাঁধার চেষ্টা শুরু হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ অধুনা প্রচলিত বানানটি চিহ্নিত করুন—
কর্ম্ম, অর্দ্ধ, অসমীয়া, হাতী, পাখি, চীৎকার।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ প্রশ্নবোধক বাক্য লিখে 'কী' ও 'কি'-এর পার্থক্য দেখান।

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কোন 'ব'-এর আগে 'ম' থাকলে সেটা 'ং' হয়ে যায়?

.....



আপনাদের করণীয়— ১৪.২

সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী লিখিত বাংলা বানান আর সংশোধিত বানানের মধ্যে কীধরনের পার্থক্য দেখলেন, তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

.....

.....

.....

.....

১৪.৫.২ অশুদ্ধ বানান ও তার সংশোধিত রূপ

এখানে যে বানান তালিকা দেওয়া হল তার সাহায্যে আপনারা বাংলা বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতে পারবেন।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অদ্ভূত	অদ্ভুত	পুরষ্কার	পুরস্কার
অনুকুল	অনুকূল	আবিস্কার	আবিষ্কার
আলস্যতা	অলসতা, আলস্য	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
অশ্রুজল	অশ্রু, চোখের জল	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
অসহ্যনীয়	অসহনীয়	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
অহর্নিশি	অহর্নিশ	অর্দ্ধ	অর্ধ
অধিবাসীগণ	অধিবাসিগণ	সন্মুখ	সম্মুখ
কিম্বা	কিংবা	সন্মতি	সম্মতি
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	সন্মান	সম্মান
স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর	আশীষ	আশিস
বশম্বদ	বশংবদ	মধুসুদন	মধুসূদন
একত্রিত	একত্র	দূর্গা	দুর্গা
পার্বত্য	পর্বতীয়	ঋষিকেশ	হৃষীকেশ
ঐক্যতা	একতা	সমীচিন	সমীচীন
সখ্যতা	সখ্য	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
ব্যবসা	ব্যবসায়	উপযোগীতা	উপযোগিতা

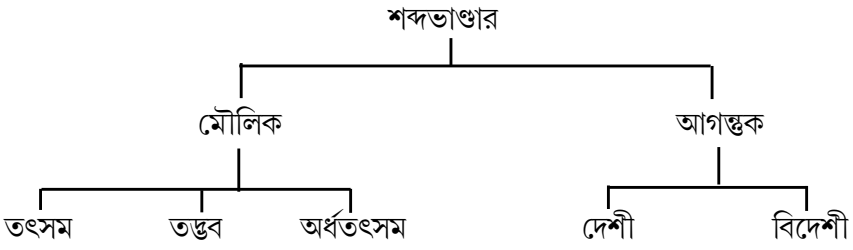
দোষণীয়	দূষণীয়	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	কালীদাস	কালিদাস
মনযোগ	মনোযোগ	কালি	কালী
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	পিতামাতা	মাতাপিতা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
সম্বাদ	সংবাদ	মহিমাময়	মহিমময়
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	নির্দোষী	নির্দোষ
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
প্রাতঃভ্রমণ	প্রাতর্ভ্রমণ	ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	পরমাসুন্দরী	পরমসুন্দরী
তিরষ্কার	তিরস্কার	আপ্রাণ	প্রাণপণ
খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ	সঙ্গীত	সংগীত
বৃটেন	ব্রিটেন	গুণাবলী	গুণাবলি

১৪.৬ শব্দভাণ্ডার

শব্দ গেঁথে-গেঁথেই আমাদের কথা-মালা। যে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারে নিজের ভাষার প্রাচীন ও পরিবর্তিত শব্দ তো থাকবেই তার সঙ্গে থাকবে অন্য ভাষার ধার করা শব্দ। বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতের মাটিতে আদি-অধিবাসীদের ভাষা এবং পরবর্তী বৈদিক-আর্যদের কথ্য ভাষার উপাদান বাংলায় থাকাটা অসম্ভব নয়। কেননা ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে বৈদিক ভাষাই কালক্রমে বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর জন্ম দিয়েছে। তবে বাংলাভাষার সৃষ্টি, অন্যান্য ভাষার মতোই এরকম একরৈখিক নয়। বিবর্তিত হতে হতে অন্যান্য ভাষা থেকেও বাংলাভাষা শব্দ গ্রহণ করেছে। এমনকী যাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ ঘটোছিল বাঙালির, তাদের ভাষার কিছু শব্দও বাংলার ভাণ্ডারে জমা হয়েছে।

১৪.৬.১ শ্রেণিবিন্যাস

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডায়কে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়—



এই ছক অবলম্বনে বলা যায়, বাংলা শব্দ প্রধানত দুই জাতির — মৌলিক ও

আগন্তুক। মৌলিক শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে গৃহীত বা আগত। আগন্তুক শব্দ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে নেওয়া।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১১ ঃ ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে কোন ভাষা কালক্রমে বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্ম দিয়েছে?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ বাংলা শব্দভাণ্ডারে মৌলিক শব্দ কত প্রকার?

.....

১৪.৬.২ মৌলিক শব্দ

যে-সব শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসে বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। এগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- (১) তৎসম, (২) তদ্ভব এবং (৩) অর্ধ তৎসম

- *তৎসম শব্দ ঃ* সংস্কৃত ভাষা থেকে যে-সব শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। এরা উচ্চারণে সংস্কৃতের মতো নয় তবে আকৃতিতে অপরিবর্তিত। (মনে বাধতে হবে, 'তৎ'বলতে সংস্কৃতকে বোঝায়। তৎ > তার + সম > সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের মতো) যেমন— অঙ্গ, অগ্নি, আকাল, আঘাত, ঈশ্বর, উত্তর, তৃণ, নক্ষত্র, শান্তি, শ্রম।



আসুন জেনে নিই...

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণে সমস্ত শব্দের উৎস হিসাবে শব্দরূপ এবং সমস্ত ক্রিয়া বা কাজের উৎস হিসাবে ধাতুবংশকে মূল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন চক্র, পক্ষী, মঙ্গল (শব্দরূপ) অথবা √গম্ (যাওয়া কোমালে), √কৃ (করা বোঝালে), √ভূ (হওয়া অর্থে)। বাংলায় যেসব সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়োছ সেগুলো বিভিন্ন শব্দরূপের প্রথমার (কর্তৃকারকের) এক বচনের রূপ। যেমন 'আকাশঃ' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'আকাশঃ' বা 'নর' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'নরঃ'। বাংলায় এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় কিন্তু তা উচ্চায়ণে ও রূপে আলাদা। শব্দান্তের বিসর্গ উচ্চারিত হয় না এবং তা শব্দের শেষে বসেও না। সংস্কৃতের স্বরান্ত শব্দগুলো বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত হয়ে যায়।

- *তদ্ভব শব্দ ঃ* যে-শব্দ সংস্কৃত অর্থাৎ আদি ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষায়

গৃহীত হয়েহে, তাকে তদ্ভব শব্দ বলে।

এই বিবর্তন একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়েছে। সংস্কৃত 'কার্য' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে হল 'কজ্জ'। এটা আকর রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় 'কাজ' হয়েছে। বাংলার কেয়েকটি তদ্ভব শব্দ — অঙ্ক > আঁক, অদ্য > আজ, কাষ্ঠ > কাঠ, কমকার > কামার, নৃত্য > নাচ, জালিক > জেলে, পত্র > পাতা, মৎস্য > মাছ, সামন্তপাল > সাঁওতাল, দ্রম্য > দাম, পর্ণ > পান (পাতা)।



আসুন জেনে নিই...

শুধু সংস্কৃত শব্দই নয়, ইন্দোইউরোপীয় — যেমন, গ্রীক, প্রাচীন পারসিক ভাষা, মোঙ্গল গোষ্ঠীর ভাষা বা দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বহু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে পরে তা আবার বিবর্তনের নিয়মে বাংলায় তদ্ভব শব্দ হিসাহে এসেছে। সুতরাং এই শব্দগুলোর মূল উৎস এই ইন্দোইউরোপীয়, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। যেমন, ইঁচলা (মাছ) উলু, খাল, তেঙা, সিমই (সেত্তয়াই), তুরুক ইত্যাদি।

- *অর্ধতৎসম শব্দ ঃ* যে-সমস্ত শব্দ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছিল কিন্তু কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন ও উচ্চারণ বিকৃতি এড়াতে পারেনি, তাদেয় অর্ধতৎসম শব্দ বলে। এদের ভগ্নতৎসম শব্দও বলা যায়। যেমন — অগ্রহায়ণ > অঘ্রাণ, অভ্যাস > অব্যেস, কীর্তন> কেত্তন, শ্রী> ছিরি, বৈষ্ণব >বোষ্টম, মহোৎসব >মোচ্ছব, সমর্থ >সোমও, প্রোতিনী >পেতনি।

১৪.৬.৩ আগন্তুক শব্দ

যে-সমস্ত শব্দ ভারতবর্ষের প্রচীনতর অধিবাসীদের ভাষা থেকে বা বিদেশী কোনো ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে আগন্তুক শব্দ বলে। এজন্য আগন্তুক শব্দের দুটি শ্রেণি আছে — দেশী এবং বিদেশী। এই শব্দগুলোকে 'কৃতঋণ' শব্দও বলা হয়।

- *দেশী শব্দ ঃ* দেশী শব্দগুলোর উৎস অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় বা অন্য কোনো অজ্ঞাত ভাষা বংশ। যেমন— ডিম, ঢোঁড়া, কলা, ডাব, সিঙা, ঢিল, চিংড়ি হনজন্, শন্‌শন, হৈ, হৈ (অনুকরি শব্দ) ইত্যাদি।
- *বিদেশী শব্দ ঃ* বিদেশ বা বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার ফলে সে-সমস্ত বিদেশী ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে।



আসুন জেনে নিই...

বাংলায় তুর্কি আক্রমণের সূত্রে ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আর ফার্সির সূত্রেই আরবি। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসিরা ব্যবসা-সূত্রে এসে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত কায়েম হল ইংরেজ শাসন। বাংলায় সবচেয়ে বেশি এসেছে আরবি-ফার্সি আর ইংরেজি শব্দ। সংস্কৃতির যোগাযোগ সূত্রে কিছু চিনা, জাপানি, রাশিয়ান, জার্মান, ইতালিয়, ব্রহ্মদেশীয় শব্দও বাংলায় এসেছে।

- *আরবি শব্দ ঃ* আক্কেল, আজান, আসবাব, ইজ্জত, খারিজ, গজল, তবলা, জরিমানা, জ্বালাতন, নকল, নগদ, মতলব, লোকসান, সাহেব, হাকিম, হিসাব ইত্যাদি।
- *ফার্সি শব্দ ঃ* আন্দাজ, কোমর, খরিদ্দায়, খুলি, গরম, চলামা, চাকর, চেহারা, দরখাস্ত, দরজা, দোকান, পছন্দ, পোশাক, বাজার , মগজ, মোরগ, সানাই, সবুজ, হামেশা ইত্যাদি।
- *তুর্কি শব্দ ঃ* আলাখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কুলি, চাকু, দারোগা, বাবুর্চি, সুলতান, কুর্নিশ ইত্যাদি।
- *পোর্তুগিজ শব্দ ঃ* আনারস, আলমারি, ইস্তিরি, জানালা, পেরেক, বারান্দা, বোতাম, বেহালা, সাবান, বাসন, কামিজ, পাঁউরুটি ইত্যাদি।
- *ফরাসি শব্দ ঃ* আঁতাত, কার্তুজ, গ্যারাজ, রেস্তোঁরা, মেনু, রেনেসাঁ ইত্যাদি।
- *ওলন্দাজ শব্দ ঃ* ইস্কুরুপ, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, বুর্জোয়া ইত্যাদি।
- *ইংরেজি শব্দ ঃ* অর্ডার, উল, ককি, মাষ্টার, কফি, কাটলেট, চেয়াব, চেক, কেরোসিন, টিকিট, ট্রেন, সিনেমা, টেবিল, কলেজ, কোন, থিয়েটার ইত্যাদি।



আসুন জেনে নিই...

উনিশ শতকের শুরুতে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছিল যা তদ্ভব শব্দেয় মতো ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে দেখা যায়। যেমন — আপিল, ইঞ্চি, জাঁদরেল, বুরুশ, পলেস্তারা, বেঞ্চি, হাসপাতাল, লজেঞ্চুস, আর্দালি, কৌঁসুলি, গারদ ইত্যাদি।

- *চিনা শব্দ ঃ* চা, চিনি, লুচি, বেইজিং, সাংহাই ইত্যদি
- *জাপানি শব্দ ঃ* নিপন, রিক্সা, হারিকিরি, জুজুৎসু, হাসনুহানা ইত্যাদি।
- *জার্মান শব্দ ঃ* নাৎসি, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি।
- *ইতালির শব্দ ঃ* স্টুডিও, ম্যালেরিয়া, ফাসিস্ত, ম্যাজেণ্টা, পাস্তা, পিৎজা ইত্যাদি।
- *রাশিয়ান শব্দ ঃ* সোভিয়েট, বলশোভিক, ভড্‌কা, স্পুটনিক, জার ইত্যাদি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ দুটি বাংলা তৎসম শব্দ লেখো।

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ সংস্কৃত 'কার্য' শব্দটির বাংলা তদ্ভব রূপ কোনটি?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ সোমও, ছিরি ইত্যাদি শব্দগুলো কোন শ্রেণির?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ বাংলা ভাষার আগন্তুক শব্দগুলো অন্য কী নামে পরিচিত?

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় বা অন্য কোনো অজ্ঞাত ভাষাবংশ থেকে যে-শব্দগুলো বাংলায় এসেছে, তাদের কী বলে?

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ দুটি আরবি শব্দ লেখো।

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ পাস্তা, পিৎজা ল— এই দুটি কোন বিদেশী শব্দের অন্তর্গত?

.....

১৪.৭ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দের সংখ্যা খুব একা কম নয়। ভাষার মাধুর্যগুণ সঞ্চারিত করতে প্রতিশব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রতিশব্দগুলোই আসলে সমার্থক শব্দ। একই অর্থ বোঝাতে যে-শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় তাদেরই সমার্থক শব্দ বলে।

আর যে শব্দসমূহ অন্য শব্দের উল্টো বা নঙর্থক অর্থ প্রকাশ করে সেগুলোকে বিপরিতীর্থক শব্দ বলে।

১৪.৭.১ সমার্থক শব্দ

এখানে উদাহরণ হিসাবে কায়কটি সমার্থক শব্দ উল্লেক করা হয়েছে-

অগ্নি	ঃ	আগুন, পাবক, বিভাবসু, বহ্নি
অন্ধকার	ঃ	আঁধার তমসা, তমঃ, তিমির
আকাশ	ঃ	গগন, অম্বর, নভঃ, অন্তরীক্ষ
উত্তম	ঃ	ভালো, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, উপাদের
কন্যা	ঃ	মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা

গৃহ	-	ঘর, ভবন, নিকেতন, আবাস
জল	-	বারি, নীর, পানীয়, জীবন
নদী	-	তটিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী
পদ্ম	-	অরবিন্দ, কোকনদ, সরোজ, পঙ্কজ
পৃথিবী	-	ধরনী, বসুন্ধরা, মেদিনী, বসুমতী
মেঘ	-	জলদ, পর্জন্য, অম্বুদ, নীরদ
রজনী	-	যামিনী, নিশা, শর্বরী, রাত্রি
সূর্য	-	অর্ক, আদিত্য, তপন, মিহির

১৪.৭.২ বিপরীতার্থক শব্দ

এখানে উদাহরণ হিসাবে কারমটি বিপরীতার্থক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে —

অবতরণ - উত্তরণ	বক্র - ঋজু
উদায় - সঙ্কীর্ণ	আস্তিক - নাস্তিক
প্রাচীন - অর্বচীন	আবাহন - বিসর্জন
উজান - ভাঁটা/ভাঁটি	আসামি - ফরিয়াদী
অজ্ঞ - বিজ্ঞ	জঙ্গম - স্থাবর
স্বাধীন - পরাধীন	টাটকা - বাসি
গুপ্ত - ব্যক্ত	বন্ধন - মুক্তি
অমৃত - গরল	বিষাদ - হর্ষ
অনুরাগ - বিরাগ	লোভী - নির্লোভ
অন্তর - বাহির	পূর্ণ - শূন্য
কৃত্রিম - স্বাভাবিক	সরল - কপট
কনিষ্ঠ - জ্যেষ্ঠ	আকার - নিরাকরি।



১৪.৮ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও তাদের বাক্যে প্রয়োগ।
- বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের বাক্যে বিশিষ্ট প্রয়োগ।
- শব্দভাণ্ডারের শ্রেণিবিভাগ।
- মৌলিক শব্দের রূপভেদ ও উৎস।

- আগন্তুক শব্দের নানা উৎস।
- বিপরীতার্থক ও সমার্থক শব্দ।
- বাংলা বানান যথার্থভাবে লেখার জন্য কয়েকটি নিয়ম।
- কয়েকটি সাধারণ ভুল ও তার বানানের শুদ্ধ রূপ।



১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

১) চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।*

২) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; *আকাদেমি বানান অভিধান*।

৩) পশ্চিমবঙ্গ সংসদ; *সংসদ বানান অভিধান।*

৪) সরকার, পবিত্র; বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।

৫) সেন, সুকুমার; *ভাষার ইতিবৃত্ত।*

১৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ পদ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিভিন্ন কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) অশুদ্ধ। (খ) অশুদ্ধ। (গ) অশুদ্ধ। (ঘ) শুদ্ধ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈচিত্র্য আসে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আকাশ-কুসুম।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অত্যন্ত আদরের।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অষ্টাদশ শতকে।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পাখি।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ -তুমি কী খাবে?
-তুমি কি খাবে?

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বর্গীয় 'ব'। (অর্থাৎ যে 'ব'টি প-বর্গে আছে)

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈদিক ভাষা।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ তিনি প্রকার।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঈশ্বর, তৃণ।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাজ।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অর্ধ তৎসম।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কৃতঋণ শব্দ।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দেশী শব্দ।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আসবাব, জরিমানা?

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইতালিয়।



১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন নং ১ ঃ কোনটি কী পদ উল্লেখ করে পদ পরিবর্তন করুন —

অগ্র, আগ্নেয়, ইচ্ছা, অংশ, কর্মী, ধার্মিক, নিশা, মেটে, উৎকর্ষ, সমুদ্র, প্রবল, দরিদ্র।

প্রশ্ন নং ২ ঃ অশুদ্ধি সংশোধন করুন —

দীপাবলী, চীৎকার, বর্জ্জন, ইংরেজী, বাঙ্গালী, অংক, সম্বাদ, ভয়ঙ্কর, ছোট, পনের, আজো, ক্ষেত, বাগদেবী।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক শব্দ কোনগুলি? উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাংলা ভাষার আগন্তুক শব্দের মূল উৎস কী কী?

প্রশ্ন নং ৫ ঃ বিদেশী শব্দের দুটি উৎস উল্লেখ করে প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ পাঁচটি দেশী শব্দের উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ তৎভব শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছের দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন—

অগ্নি, নদী

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বিপরীত শব্দ লিখুন — ফরিয়াদী, আবাহন, অনুরাগ, অর্বাচীন, কপট।

*** এ-ছাড়া অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নমালায় যে-ধরনের প্রশ্ন দেখেছেন, সে-ধরনের প্রশ্নও থাকতে পারে।**

*** ***** ***

অধ্যায় ১৫ ঃ সংবাদ, অনুচ্ছেদ ও সারাংশ রচনা

অধ্যায় বিন্যাস

১৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৫.২ পরিচিতি
১৫.৩ রচনার নানা প্রকারভেদ
১৫.৪ সংবাদ রচনা
১৫.৫ অনুচ্ছেদ রচনা
১৫.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৫.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৫.১ জ্ঞাত্যব বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার মধ্যে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন
- সংবাদপত্র বা টিভিতে পরিবেশনের উপযোগী সংবাদ লিখতে পারবেন।

১৫.২ পরিচিতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আপনারা বাগ্‌ধারা, পদ পরিবর্তন, শব্দভাণ্ডার, বানানশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধে জেনেছেন। আপনি, আমি—আমরা সবাই যখন মনের ভাব প্রকাশ করি তখন এই উপাদানগুলোকে ভাষায় প্রয়োগ করলে তা শ্রোতার শুনতে ভালো লাগে। অবশ্য আপনি যখন কিছু লিখছেন তখনও এগুলো প্রয়োগ করলে রচনা আকর্ষণীয় হয়। লেখার সময় আরও অনেক কিছু করার আছে। আপনাকে দেখতে হবে, যা লিখছেন তার মূল কথাটা যুক্তিসহ হবে এবং পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে সরল-সুন্দর ভাষায়। কারণ যা বলছেন বা লিখছেন তা যদি পাঠক পড়ে বুঝতে না পারেন তবে লেখার পরিশ্রমটা ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভালো লেখার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আর কে না জানে, **যত অনুশীলন করবেন তত দক্ষ হয়ে উঠবেন**। অনুশীলনও আপনাকে করতে হবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি হল সাধারণ কয়েকটি নিয়ম, যা মানলে আপনার রচনাটি সার্থক হবেই। এই নিয়মগুলোর মধ্যে আছে—

- নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভাবা এবং আপনার ধারণাগুলো একে একে মনের মধ্যে জমা করা।
- ভাবনাগুলো কীভাবে প্রকাশ করবেন সেটা সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা করে তার প্রাথমিক রূপটা লিখে ফেলা।
- এই খসড়া লেখাটাকে নানা যুক্তি বা উদাহরণ দিয়ে অথবা অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বাড়ানো।

- সম্পূর্ণ রচনাটিকে আরও তথ্য দিয়ে সাজানো যায় কি না দেখা, বানান ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা।

বর্তমান অধ্যায়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ লিখবেন, অনুচ্ছেদ লিখবেন সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

১৫.৩ রচনার নানা প্রকারভেদ

আপনি যেখানে আছেন তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে লেখার নানা উপাদান। মনে করুন, আপনি একটি শহরে আছেন অথবা শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে। আপনি প্রতিদিনই এখানে নানা ধরনের মানুষ-জন দেখছেন, নানা ঘটনা ঘটছে— নিজে দেখছেন অথবা টিভি, সংবাদপত্রে জানছেন। আজকাল তো টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি মানুষ বিশ্বের নানা খবরই পেয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রত্যেকদিনের অভিজ্ঞতায় এই ছবিগুলো বা খবরগুলো আপনাকে অবশ্যই ভাবায়। এই ভাবনাগুলোই এক একটি বিষয় হয়ে ওঠে লেখার। লেখার অর্থ হল আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ আপনার চারপাশে ঘটে চলা নানা ঘটনার মাঝখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটিকে বিষয় হিসাবে নিয়ে যদি বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা লিখিত আকারে প্রকাশ করেন তাবে সেটাই রচনা। আপনার ভাবনাগুলো কবিতার আকারে বা গদ্যের আকারে প্রকাশ পেতে পারে। আমরা এখানে গদ্যরচনার কথাই ভাবছি। নানা বিষয়কে গদ্যের রীতিতে আপনি যখন লিখবেন তখন আরও একটি ব্যাপার আপনার নজরে পড়বে। একটি ক্রিকেট খেলা বা কোনো দুর্ঘটনার কথা আপনি যে ভাবে লিখছেন ঠিক সেভাবে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে একজন ধর্মগুরুর কোনো ধর্ম উপদেশ সম্পর্কে আপনার অনুভব বা উপলব্ধির কথা লিখতে পারছেন না। নিজের পুরনো দিনের কথাগুলো যেভাবে লিখছেন একজন জননেতা বা বিশ্ববন্দিত মহান মানুষের জীবনকাহিনি ঠিক একই সুরে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। কোনোটাতে যা দেখছেন তাকেই বর্ণনা করতে হচ্ছে বা বিবরণ দিতে হচ্ছে, কোনোটাতে বিরবণের সংগে চলে আসছে আপনার নিজস্ব অনুভূতি বা চিন্তা-ভাবনা। আপনার লেখা হয়ে উঠছে বিবরণাত্মক বা বর্ণনাধর্মী এবং বিশ্লেষণাত্মক। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী কখনও তা হয়ে উঠছে গুরুগম্ভীর আবার কখনও লঘু হাস্যরসাত্মক। আসলে লেখা একটা শিল্প বা আর্ট। শিল্পী যেমন চারপাশের পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ নিয়ে নানা রূপে-রঙে-রেখায় তাকে প্রকাশ করেন, লেখকও তেমনই নানা রূপে তাঁর লেখাকে প্রকাশ করেন। গদ্যসাহিত্যে এই রূপগুলোকে আমরা কখনও বলি প্রবন্ধ, কখনও স্মৃতিকথা, কখনও রম্যরচনা, কখনও অনুচ্ছেদ। আপনার বিবরণ বা বিশ্লেষণ এই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। অনুচ্ছেদ যদিও প্রবন্ধের মধ্যেই থাকে তবু আজকাল সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলগুলোর প্রয়োজনে আলাদাভাবে অনুচ্ছেদ লেখায় গুরুত্ব বেড়েছে।

১৫.৪ সংবাদ রচনা

আজকাল সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র দপ্তরে বা সাংবাদিক হিসাবে কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে। অনেকেই এখন এই পেশার সঙ্গে জড়িত হতে চাইছেন। ফলে সংবাদ লেখার একটা ধারণা নিয়ে রাখা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ রচনার অভ্যাস সংবাদ লেখার ভিত্তি। যথার্থ অনুচ্ছেদ রচয়িতা একজন ভালো সাংবাদিক হতে পারেন। একজন সাংবাদিককে তাঁর সংগৃহীত খবরটি সংবাদপত্রের দপ্তরে লিখিতভাবে পাঠাতে হয়। সুতরং তিনি যদি অনুচ্ছেদ লেখার অভ্যাস করেন তবে এই কাজটিও তাঁর কাছে সহজ হয়ে যায়।

সংবাদ লেখার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটি সাধারণ সূত্র আর কয়েকটি ভাষাসম্পর্কিত। যেহেতু আমরা বাংলায় সংবাদ লেখার কথা ভাবছি সেইহেতু এখানে বাংলা ভাষার কথাই বলব।

- বাংলা আধুনিক বানান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।
- বিভিন্ন বিরামচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা চাই।
- বাক্যগঠন যেন অযথা জটিল না হয়। ছোট ছোট সরল বাক্যে লিখতে হবে।
- অত্যধিক তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা ছেড়ে দিতে হবে।
- অনুবাদের সময় লক্ষ রাখতে হবে তা যাতে বাংলা ভাষারীতিকে মেনে চলে। একই ইংরেজি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। কোনটি সঠিক প্রয়োগ হবে সেটা খেয়াল করবেন।
- সঠিক শব্দ ব্যবহারে যাতে খবর পরিবেশন সুখপাঠ্য হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- সংবাদ পরিবেশনে তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- অভিধানচর্চা করে নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারের পরিধি অবশ্যই বাড়িয়ে তুলতে হবে। এছাড়া পেশাটির প্রতি আকর্ষণ এবং পরিস্থিতির প্রতি সচেতনতাও থাকা প্রয়োজন।



আসুন জেনে নিই ...

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতার পাঠ নেবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। মূল কারিগরি বিদ্যা যেখান থেকে অর্জন করা গেলেও বাংলা ভাষায় লেখার দক্ষতা আসবে নিজস্ব অনুশীলনের দ্বারাই।

সংবাদ রচনার কয়েকটি নমুনা এখানে আপনারা দেখে নিন ঃ

- **অমরনাথ যাত্রীদের জন্য শীঘ্রই মোবাইল পরিষেবা শুরু**

নয়াদিল্লি, ২০ মে ঃ জুন মাসের ৩০ তারিখের আগেই অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় মোবাইল ফোনের সংযোগ গড়ে তোলা হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সচিন পাইলট। বৃহস্পতিবার তিনি

বলেন, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বি এস এন এল) ভৌগোলিক জটিলতা কাটিয়ে দেশের পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ থেকেও যাতে মানুষ মোবাইল সংযোগের আওতায় থাকেন তার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করে চলেছে। প্রতিবছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় যান। তাঁদের সঙ্গে মোবাইল ফোন থাকলেও তাতে কোনোরকম নেটওয়ার্ক থাকে না। কারণ ওই উচ্চতায় কোনো মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হয়নি এতদিন। তবে অমরনাথ গুহার ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় গিয়েও তীর্থযাত্রীদের মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন না-হয় এবং তাঁরা যাতে বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বি এস এন এল। আগামী ৩০ জুনের আগেই অমরনাথ গুহার ওই উচ্চতায় মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হবে। এই মুহূর্তে মোট ন'টি মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও যাদের কাছে ফোন থাকবে না, তাঁরাও যাতে বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখতে পারেন তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে ৩০ জুনের আগে এই পরিষেবা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

- **বিজ্ঞানে পঞ্চম রুবুল ডাক্তার হতে চায়**

নিজস্ব সংবাদদাতা, বরপেটা, ২৮ মে ঃ ২০১০ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ভেল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রুবুল হুসেইন পঞ্চম স্থান দখল করে। রুবুল মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সমগ্র অসমের মধ্যে নবন স্থান দখল করেছিল। সে ডাক্তারি নিয়ে পড়তে চায়। ভেল্লা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান শাখার ডেমনস্ট্রেটর আবুল হুসেইন ও মাজদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষিকা নূর বেগমের দ্বিতীয় সন্তান রুবুল। রুবুলের সাফল্যে খুশি সমগ্র ভেল্লা অঞ্চল। তার স্কুলের অধ্যক্ষ উপেন দাসসহ সব শিক্ষক-শিক্ষিকাও রুবুলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তার সাফল্যের পেছনে কাদের অবদান রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে রুবুল জানায়, মা-বাবা, স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সমগ্র এলাকার জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই সাফল্য এসেছে। প্রথম দশজনের মধ্যে থাকবে বলে রুবুলের আত্মবিশ্বাস ছিলই। সে পঞ্চম স্থান পাবে তা ভাবতে পারেনি। ভবিষ্যতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ে একজন ভালো চিকিৎসক হতে চায় রুবুল। ফলাফল অনুযায়ী রুবুলের প্রাপ্ত নম্বর ইংরেজিতে ৮০, অসমীয়া ৮৯, অংকে ৯০, পদার্থ বিজ্ঞান ৯৬, জীববিদ্যা ৮৮, রসায়েন ৯৩। গোটা রাজ্যে বিজ্ঞান বিভাগে তাঁর স্থান পঞ্চম।

- **বেজিংয়ে বাণিজ্য বিভাগ খুলবে দিল্লি**

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মে ঃ চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে এবার বেজিংয়ের ভারতীয় দূতবাসে বাণিজ্য বিষয়ক পৃথক বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি। বুধবার মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই বিভাগের কাজ হবে রফতানি ও লগ্নির ক্ষেত্রে ভারতের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো। এ ছাড়া, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন বাণিজ্যিক দিক চিহ্নিত করা, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোও এর কাজের মধ্যে পড়বে। বিদেশ সচিব নিরুপমা রাওয়ের কথায়, 'দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ভারসাম্য এখনও ঠিক জায়গায় নেই। এ জন্য ঐক্যবদ্ধ

ভাবে সচেষ্ট হতে হবে।' প্রসঙ্গত, আজই চিন সফর শুরু করলেন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল। তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন বিদেশ সচিবও।

এই নমুনা তিনটি খুঁটিয়ে পড়ুন। সংবাদ লেখায় পদ্ধতিটি আপনাদের নজরে পড়বে। পদ্ধতিটি এই সূত্র অনুসারে হবে—

- একটি শিরোনাম।
- সংবাদ সূত্রের উল্লেখ করতে হবে স্থান ও তারিখের ক্রমান্বয় মেনে।
- সংবাদের মূল অংশ।



আসুন জেনে নিই ...

- খবর ও প্রতিবেদনের যেটা একেবারে সূচনাংশ তাকে ব্রিটেনে বলা হয় 'ইনট্রো', আমেরিকায় 'লিড'। খবরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এর গুরুত্ব অনেকখানি।
- খবরের ইনট্রো আর টেলিগ্রাম লেখা প্রায় একই। তাই খবরের সবচেয়ে জরুরি অংশটুকুই সূচনায় লেখা চাই, যেমন টেলিগ্রামে লেখা হয়। তবে টেলিগ্রামের সাংকেতিকতার বদলে এখানে একটি পূর্ণ বাক্যই গঠন করতে হয়।
- পাশ্চাত্যের নানা কাগজে 'ইনট্রো'র ঊর্ধ্বতম শব্দসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়। যাঁরা এই শব্দসংখ্যার বাঁধন পছন্দ করেন না তাঁরাও বলেন যে তিরিশ থেকে চল্লিশটি শব্দই এর জন্য যথেষ্ট।

সূচনাংশের দৈর্ঘ্য অনাবশ্যক বাড়িয়ে তুললে তা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে বাধ্য। আর দীর্ঘ বাক্য সবসময়ই বক্তব্যকে জটিল ও অস্পষ্ট করে তোলে। তাই সূচনাংশ বা ইনট্রোসহ পুরো খবরটাই ছোট ছোট বাক্যাংশে লেখা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে একই শব্দ যাতে বারবার লেখা না হয়। তাতে সংবাদপাঠে একঘেয়েমি আসে। একই নাম, একই তথ্য ঘুরেফিরে লেখা হলে তা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। আপনারা এর আগে জেনেছেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা সহজ-সরল হওয়া চাই। তবে সরল ভাষা বলতে কিন্তু তরল ভাষা বোঝায় না। উচ্ছ্বাস ও কাব্যিকতা যেন সংবাদের ভাষায় প্রকাশ না পায়, তা দেখতে হবে। মান্য চলিত বাংলায় এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশরীতিকে অক্ষুন্ন রেখেই বক্তব্য বলতে হবে।

এবার আপনারা নমুনাগুলোর দিকে তাকান। কী দেখছেন? প্রত্যেকটারই একটি সংবাদ শিরোনাম রয়েছে। তারপর প্রথানুযায়ী মোটা অক্ষরে সংবাদটি কে দিচ্ছেন, কোথা থেকে দিচ্ছেন এবং কোন তারিখে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর আছে ইনট্রোসহ সম্পূর্ণ সংবাদ। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রথম দুটি নমুনায় বেশ কিছু গণ্ডগোল রয়েছে।

প্রথমত, দুটিতেই যে ইনট্রো রয়েছে তা সীমিত শব্দ সংখ্যায় লেখা হলেও উপযুক্ত নয়। কারণ প্রথম নমুনায় তথ্য বিস্তার ঘটেছে। আর একই তথ্য সংবাদের পুরো শরীর জুড়ে বারবার এসেছে। খবরটিতে যে তথ্যগুলো আছে তা এইরকম—

- অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের মোবাইল পরিষেবা লাভের সুযোগ করে দেবে বি এস এন এল।
- ৩০ জুনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় ন'টি টাওয়ার বসবে।
- কথাগুলো বলেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী সচিন পাইলট।

এখানে যেহেতু অমরনাথে তীর্থযাত্রীদের মোবাইল পরিষেবা পাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেহেতু শিরোনামে তা এসেছে। কিন্তু 'শীঘ্রই' শব্দটির বদলে 'অচিরে' ব্যবহার করা যেত। অথবা 'শিগগির'ও লিখতে পারি। 'শুরু' শব্দটা বাদ দিলেও শিরোনামের আকর্ষণ কমে যায় না। কিন্তু এই পরিষেবা যে বি এস এন এল শুরু করবে, সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই শিরোনামটা এ-রকম হতে পারত— 'অচিরেই অমরনাথে বি এস এন এল-এর মোবাইল পরিষেবা' 'অথবা 'অমরনাথে শিগগিরই মোবাইল পরিষেবা দেবে বি এস এন এল'। খবরটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হবে। কিন্তু এই বুথের কথা কোথাও নেই। 'প্রতিবছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় যান', তাঁদের মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্ক থাকে না, বি এস এন এল ভৌগোলিক জটিলতা কাটিয়ে কি করছে— ইত্যাদি প্রসংগগুলো বাদ দিলে বা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করলে ভালো হত। ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতা আর ৩০ জুন প্রসঙ্গ দুটি বারবার এসেছে। যাতে একবার ব্যবহার করেই কাজ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাও নেওয়া যেত। তাহলে সংবাদ পরিবেশনটি যথার্থ হত।

দ্বিতীয় নমুনাতে রুবুলের ডাক্তার হবার ইচ্ছেটাই আসল। সে কথা শিরোনামে হলেও সংবাদ সূচনা বা ইনট্রোতে আসেনি। এটা একটা ত্রুটি। রুবুলের ফলাফলও এখানে অতিরিক্ত তথ্য। বাক্য গঠনে জটিলতা তো আছেই, সে যে পঞ্চম হয়েছে এ তথ্যও দুবার এসেছে। এইসব দুর্বলতা আছে এই সংবাদটিতে।

তৃতীয় নমুনাটিকে আপনারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এর শিরোনাম পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সূচনাংশ আমাদের সম্পূর্ণ তথ্য জানাচ্ছে। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেটা যেমন স্পষ্ট হল ইনট্রোতে, তেমনি তা শিরোনাম থেকেও দূরে সরে গেল না। খবরের পরবর্তী অংশে চলে এল কোথায় বসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই বক্তব্য। বিদেশ সচিবের নাম একবার ব্যবহার করে তাঁর উক্তিও এখানে জুড়ে গেল। অর্থাৎ বোঝা গেল পাঠকের কাছে উক্তিটা জরুরি নয়, খবরটাই জরুরি।

মনে রাখবেন, টেলিভিশনের বিভিন্ন 'নিউজ চ্যানেল'-এ খবর পড়ার জন্য যে সংবাদ লিখতে হয়, তার পদ্ধতিটাও একই।



আপনাদের করণীয় — ১৫.১

১ নং ও ২ নং নমুনা দুটিকে নিজের অনুভব অনুযায়ী ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

১৫.৫ অনুচ্ছেদ রচনা

'Paragraph Writing'কে আমরা এখানে অনুচ্ছেদ রচনা বলে উল্লেখ করছি। এটা গদ্যে রচিত, কয়েকটি মাত্র পংক্তি এর অবয়ব রচনা করে। আর একটি মাত্র ভাবই (বা বিষয়) এখানে প্রকাশিত হয়। অনধিক ১২০ শব্দ এই অনুচ্ছেদের আদর্শ মাপ বলে বিবেচিত হবে।

মনে রাখবেন, আমরা আগের পর্বে প্রবন্ধ রচনার যে পাঠ নিয়েছি সেটাও আসলে কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমষ্টি। কোনো একটি বিষয়ে বিশদ বলতে গেলে আপনাকে কয়েকটি অনুচ্ছেদের সাহায্য নিতেই হবে। ওই অনুচ্ছেদগুলো মিলিয়েই তৈরি হয় একটি প্রবন্ধ।

এই অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি স্তর রয়েছে। আপনাকে একটি নির্দিষ্ট রচনা-প্রণালীর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তবেই আপনি যেকোনো ভাব প্রকাশক একটি সার্থক অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবেন।

প্রণালীটিকে আমরা এবাবে সাজিয়ে নিতে পারি—

- চিন্তন প্রক্রিয়া
- প্রাথমিক আদল নির্মাণ
- সম্পূর্ণ খসড়া রচনা
- যথাযোগ্য পরিমার্জন, সংশোধনের পর পূর্ণরূপ দান

যে বিষয় বা ভাব নিয়ে আপনি লিখবেন, প্রথমে সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে। সমস্ত সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে আপনি ভাববেন এবং সেই অনুযায়ী তথ্য যোগাড় করবেন। দরকার মনে হলে ওই বিষয়ে অন্য কারও মন্তব্য বা ভাবনাকেও আপনি তথ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই কাজগুলোই চিন্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাকে অনুচ্ছেদটির প্রাথমিক আদল বা রূপ তৈরি করতে হবে। এখানে আপনি প্রাপ্ত তথ্য এবং ভাবনাগুলোকে যাচাই করবেন। আপনার ভাবনাকে যথাসম্ভব মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে আসবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভাবনাকে আপনি বাদও দিতে পারেন। তবে লক্ষ রাখবেন, যে কথাগুলো আপনার অনুচ্ছেদের সংকেতসূত্র তৈরি করছে তারা যেন বাদ না পড়ে।

তৃতীয় পর্যয়ে আপনাকে অনুচ্ছেদের খসড়াটি লিখে ফেলতে হবে। এখানে যে প্রশ্নগুলোর দিকে আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে তা এরকম—

- আপনি আপনার বক্তব্য থেকে কোথাও সরে যাননি তো?
- কোনো বক্তব্যকে কি আপনার ছেঁটে ফেলা প্রয়োজন?

- আপনি কি বিষয়টিকে সুপরিস্ফুট করে তুলতে যথেষ্ট কথা বলেছেন?
- আপনি কি আর কিছু তথ্য যোগ করতে চান?
- আপনি কি বাক্যগঠনকে বদলাবেন?
- আপনার শব্দচয়ন কি যথার্থ হয়েছে?
- আপনার বাক্যগুলো কি খুব লম্বা বা ছোট (দৈর্ঘে) হয়েছে?
- আপনি কি কোনো কোনো বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে জুড়ে দেবেন?
- আপনি কি বাক্যকে ব্যঞ্জনাময় করার জন্য প্রবাদ প্রবচন বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের প্রয়োগ করবেন?
- আপনি কি খুব সহজভাবে আপনার বক্তব্যকে বোঝাতে পেরেছেন?

চতুর্থ পর্যয়ে এবার আপনি খসড়াটির সংশোধন, পরিমার্জন করবেন। আপনি ছোটখাটো ত্রুটি যেমন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বানানশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর এখানে নজর দেবেন। এরপর একটি শিরোনাম আপনাকে দিতে হবে। মনে রাখবেন এই শিরোনামে ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার করবেন না বা শিরোনামটিকে নিম্নরেখাংকিতও করবেন না। আপনি যদি অনুচ্ছেদটি কম্পুউটারে ডি টি পি করে ছাপান তবে শিরোনামটির অক্ষরগুলো '১৪ পয়েন্টে' করে তাকে 'বোল্ড' করে দিতে পারেন। নীচের নমুনাটি দেখে নিন—

'শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন' (এভাবে লিখবেন না)

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন (পাণ্ডুলিপি হলে একটু বড় অক্ষরে এভাবে লিখুন)

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন (ডি টি পি করলে এভাবে লিখুন)

এইভাবে একটি শিরোনাম দিয়েই আপনার অনুচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ হবে। শিরোনাম বাক্যটিকে অনুচ্ছেদের মধ্যে কোথাও আপনাকে রাখতে হবে। সেটা শুরুতে থাকতে পারে, অথবা মাঝখানে বা একবারে অনুচ্ছেদের শেষেও থাকতে পারে।

ধরা যাক, আপনার বন্ধু বা বান্ধবী আপনার জন্মদিনে বা যেকোনো একটি অনুষ্ঠানে আপনাকে একটি উপহার দিয়েছেন। এবার সেই বিষয়েই আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হল। আপনি কি করবেন? আপনাকে ভাবতে হবে উপহারটির বিষয়ে, ভাবতে হবে কখন কি পরিস্থিতিতে আপনি তা পেলেন আর কেই বা সেটা দিল। আপনার ভাবনাগুলো দানা বাঁধলে তা খাতায় লিখে ফেলুন। তারপর যে ক্রমিক পদ্ধতির কথা আগে বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী অনুচ্ছেদ লিখে সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

আসুন আমরা এ বিষয়টি নিয়েই অনুচ্ছেদ লেখা শুরু করি। শিরোনাম আপনি সবার শেষে দেবেন, এখানে না হয় আমরা সেটা শুরুতেই বলে দিই— 'আপনার বিশেষ উপহার।' পরীক্ষায় হয়ত এমন কিছু শিরোনাম দেওয়া থাকবে। আপনার তাতে কিছু শব্দ সংযোজনের স্বাধীনতা থাকবে। যখন আপনি লেখার শেষে শিরোনাম দেবেন তখন প্রয়োজন হলে এটি করতে পারেন।

আপনি লেখা শুরুর আগে এভাবে কয়েকটি প্রশ্ন সাজিয়ে নিতে পারেন—

- কে উপহার দিয়েছে?
- তার সংগে সম্পর্ক কী?
- উপহারটি কী?
- কেন এটি বিশেষ উপহার? (বিশেষ দিন, অনুষ্ঠান, সময় ইত্যাদি)
- বিশেষত্বের তাৎপর্য কী? (ওই বিশেষ দিনে, অনুষ্ঠানে, সময়ে কি ঘটেছিল ইত্যাদি)
- উপহার কবে পাওয়া গেছে?

লক্ষ করুন, পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যে কথাগুলো আপনার স্মৃতিতে ভেসে উঠবে সেখানে কয়েকটা অতিরিক্ত প্রসংগ এসে যেতে পারে। সংশোধনের সময় সেগুলোকে বাদ দিতে হবে। মনে রাখবেন, বক্তব্য যথাসম্ভব ছোট এবং সরল বাক্যে লেখা হবে, অবাঞ্ছিত তথ্য বাদ যাবে। এবার উত্তর—

- রবি দিয়েছে।
- খুব ভালো বন্ধু।
- একটি বাঁধানো ছবি, আমার ও রবির।
- এটা যে-দিন আমরা দুজনে বন্ধু হলাম, সেদিনের ছবি।
- এটা দিদির বিয়ের দিনের ছবি। আমার জামাইবাবুর ছোটভাইয়ের বন্ধু রবি। বরযাত্রীদের সংগে এসেছিল। দিদির বান্ধবীরা গাইছিল 'বর এসেছে বিয়ের ছাদে।' রবি এককোণে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আইসক্রিম খাচ্ছিল। ও খুব ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। আমি এক ট্রে-ভর্তি কেকের টুকরো নিয়ে যাবার সময় গালিচায় হোঁচট খেয়ে ওর গায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। ওর সাদা পাঞ্জাবিতে কেকের ক্রিম লাগানো ছবিটা কেউ তুলে নিয়েছিল। আমি অপরাধীর মতো ওর পাঞ্জাবি থেকে কেকের ক্রিমগুলো তুলে নিচ্ছিলাম।
- উপহারটি পাওয়া গেছে এ বছর ৮ মার্চ, দিদির প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন।

এই তথ্যগুলো থেকে আপনি যদি প্রাথমিক খসড়া লিখে ফেলেন তবে তার রূপটি হবে এরকম—

'এবছর ৮ মার্চ, দিদির প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন আমার খুব ভাল বন্ধু রবির কাছ থেকে আমার ও রবির একটি বাঁধান ছবি উপহার হিসাবে পেলাম। সে আমার জামাইবাবুর ছোটভাইয়ের বন্ধু, যে বিয়ের দিন বরযাত্রীদের সংগে এসেছিল। রবি খুব ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। সে দিদির বিয়ের দিন এককোণে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আইসক্রিম খাচ্ছিল আর দিদির বান্ধবীদের গান শুনছিল। দিদিরা গাইছিল 'বর এসেছে বিয়ের ছাদে।' এক ট্রে-ভর্ত্তি কেক নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, তখন গালিচায় হোঁচট খেয়ে রবির গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলাম। ওর সাদা পাঞ্জাবিতে কেকের ক্রিম লাগায় অপরাধীর মত ওর পাঞ্জাবী থেকে কেকের ক্রিমগুলো তুলে নিচ্ছিলাম যখন কেউ একজন ছবি তুলে নিয়েছিল। সেদিনই আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। রবি ভাবুক প্রকৃতির ছেলে বলে সেই দিনটির কথা মনে রেখে ৮ মার্চ ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই ওটা আমার

কাছে এক বিশেষ উপহার।'

এটা লিখে ফেলার পর আপনি এর আগে যে ১০টি প্রশ্ন পেয়েছেন, সেগুলো নিজেকেই করুন। কী কী উত্তর পাচ্ছেন, একটু দেখে নিন—

- আপনার বাক্যগঠনে অহেতুক জটিলতা এনে তাকে দীর্ঘ করার চেষ্টা হয়েছে।
- আপনার লেখায় 'দিদির বান্ধবীদের গান শোনা'র মতো অতিরিক্ত তথ্য আছে যা আপনাকে ছেঁটে ফেলতে হবে।
- ছোট ছোট বাক্যে আপনার কথাগুলোকে সাজানোর সুযোগ রয়েছে।
- আদর্শ শব্দসংখ্যার মাত্রা আপনি ছাড়িয়েছেন। অতএব তাকেও কমিয়ে আনতে হবে।

এই চারটি মন্তব্য অনুসরণ করে এবার অনুচ্ছেদটিকে আবার লিখুন। আমরা এবার এভাবে লেখাটিকে সজাতে পারি—

'এ-বছর ৮ মার্চ দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। এ-দিন ছিল দিদির প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গতবছর এদিনটাতেই রবিকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলাম। সে এসেছিল বরযাত্রী হয়ে। হই-হট্টগোলের মাঝে এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল। আমারই ভুলে হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল। ট্রে-ভর্তি কেকের টুকরো নিয়ে প্রায় দৌড়ে যাচ্ছিলাম। বিয়ের আসরে পাতা গালিচায় হোঁচট খেয়ে ট্রে-সহ পড়ে গেলাম রবির গায়ে। বেচারা হতভম্ব। আমিও ওর সাদা পাঞ্জাবিটা কেকে-ক্রিমে একাকার হয়ে যেতে দেখে বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। 'সরি' বলে ওর পাঞ্জাবি থেকে ক্রিমগুলো ওঠানোর চেষ্টা করলাম। লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। 'আরে, কিছু হয়নি' বলে রবি আমার হাতটা ধরে ফেলেছিল। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিটাও যে কেউ ক্যামেরাবন্দী করে রাখবে কে জানত ! এরপর তো বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুজনে একসংগেই ছিলাম। আর এই ছবিটাই সে আমাকে বন্ধুত্বের বিশেষ উপহার হিসাবে পাঠিয়েছে।'

এখানে লক্ষ করুন, 'বিশেষ উপহার' সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আপনি প্রথমে সূত্রাকারে ভেবেছিলেন তার সবগুলোই এখানে আছে। আপনার খসড়া লেখাটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জন করা হয়েছে। খসড়ায় যে চারটি (নিম্নরেখ শব্দগুলো দেখুন) বানান ভুল ছিল, হয় তা বর্তমান লেখায় রাখা হয়নি বা তাকে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাক্য পুনর্গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সংযোজনও হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে যাতে পুরো ছবিটা ফুটে ওঠে। সংশোধিত লেখার নিম্নরেখ বাক্যাংশ যদি আপনি বাদ দেন তবে আদর্শ শব্দসংখ্যার মধ্যেই আপনার অনুচ্ছেদটি রচিত হয়ে যায়। অতএব ওই বাক্যাংশগুলো আপনি কেটে দেবেন এবং একটি শিরোনাম আপনাকে দিতে হবে। মনে রাখবেন 'বিশেষ উপহার' কথাটি থাকবে শিরোনামে এবং অনুচ্ছেদেও। ধরা যাক শিরোনামটি হবে 'আমার বিশেষ উপহার' বা 'ছবিতে রবি ঃ এক বিশেষ উপহার' বা 'একটি বিশেষ উপহারের কথা' ইত্যাদি। লক্ষ রাখবেন নামকরণ বা শিরোনাম যাতে পাঠককে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে।

এভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন। যেমন— আপনার পড়ার টেবিল, সিনেমা হলের চেয়ে বাড়িতে বসে ছবি দেখার আনন্দ, আপনার প্রতিবেশী,

স্কুলে আপনার শেষ দিনটি, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে একটি দিন, একটি মজার ছুটি ইত্যাদি।



আপনাদের করণীয় — ১৫.২

উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন — **একটি রক্তদান শিবির**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



১৫.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- আপনারা এতক্ষণ ধরে তিনটি পর্বে বিভক্ত সংবাদ, অনুচ্ছেদ ও সারাংশ রচনার প্রসঙ্গ পড়লেন।
- অনুচ্ছেদ রচনার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়— একটা খসড়া লেখাকে কীভাবে পূর্ণ রূপ দিতে হয় তাও জেনেছেন।
- একই অভিজ্ঞতা নিয়েই সংবাদ লিখতে হবে। তবে এই অধ্যায়টি গুরুত্ব দিয়েছে আপনার চিন্তন ও লেখন ক্ষমতার উপর। আপনার বিষয় সম্বন্ধে ভাবনা ও তাকে প্রকাশের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করেছে বর্তমান অধ্যায়ের প্রসঙ্গগুলো। শুধু বিদ্যায়তনিক নয় ব্যবহারিক জীবনেও আপনাকে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট প্রসঙ্গগুলো সাহায্য করবে।



১৫.৭ অতিরিক্ত পঠন

১) বিভিন্ন ব্যাকরণ বই।

২) আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশনা; *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন।*

৩) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা; *আকাদেমি বিদ্যার্থী বংলা অভিধান।*

৪) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা ; *প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা*।

৫) ভট্টাচার্য, সুভাষ; *বাঙালির ভাষা।*

৬) মুখোপাধ্যায়, অশোক; *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ।*

৭) সরকার, পবিত্র ; *বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।*

৮) সরকার, পবিত্র ; *ভাষা-জিজ্ঞাসা* ১, ২ ও ৩।

১৫.৮ আদর্শ প্রশ্নবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নিয়ে অনুচ্ছেদ লিখুন—

(ক) একটি স্মরণীয় সংগীতানুষ্ঠান।

(খ) পাড়ায় একটি পাঠাগারের উদ্বোধন।

(গ) আপনার পছন্দের পোষাক।

(ঘ) একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

(ঙ) একটি আনন্দমুখর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন ২ ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নিয়ে সংবাদ লিখুন— (সংবাদ শিরোনাম, স্থান ও তারিখ উল্লেখ করবেন)

(ক) রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা।

(খ) রেল স্টেশনে দুটি অভিভাবকহীন শিশু উদ্ধার।

(গ) খাদ্যবস্তুর ঊর্ধ্বগামী দাম ও সাধারণ ক্রেতাদের প্রতিবাদী কর্মসূচি।

*** ***** ***



প্রসঙ্গ পুস্তক

১) আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশনা; *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন।*

২) ঘোষ, অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস।*

৩) ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাঃ); *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড।*

৪) চক্রবর্তী, অজিত কুমার; *কাব্যপরিক্রমা।*

৫) চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।*

৬) দাস, শিশির কুমার; *আত্মজীবনী ঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ।*

৭) দাস, শ্রীশচন্দ্র ; *সাহিত্য-সন্দর্শন।*

৮) দে, অধীব; *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধাৰা, ২য় খণ্ড।*

৯) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; *আকাদেমি বানান অভিধান।*

১০) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা; *আকাদেমি বিদ্যার্থী বংলা অভিধান।*

১১) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা; *প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা।*

১২) পশ্চিমবঙ্গ সংসদ; *সংসদ বানান অভিধান।*

১৩) পাল, প্রশান্তকুমার; *রবিজীবনী, ১-৯ খণ্ড।*

১৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।*

১৫) ভট্টাচার্য, সুভাষ ; *বাঙালির ভাষা।*

১৬) মুখোপাধ্যয়, অরুণকুমার; *রবীন্দ্র পরিক্রমা।*

১৭) মুখোপাধ্যায়, অশোক; *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ।*

১৮) মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর; *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য।*

১৯) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার; *রবীন্দ্র-জীবনী, ১-৪ খণ্ড।*

২০) রায়, রথীন্দ্রনাথ; *দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার।*

২১) সিংহ, মীনাক্ষী; *রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা।*

২২) সরকার, পবিত্র; *বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা*

২৩) সরকার, পবিত্র; *ভাষা-জিজ্ঞাসা ১, ২ ও ৩।*

২৪) সেন, সুকুমার; *ভাষার ইতিবৃত্ত।*

২৫) সেন, সুকুমার ; *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।*

২৬) Abrams, M. H. *A Glossary of Literary Terms*